স্বাস্থ্য চিত্রে ও গল্পে।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি, এ

শিশির পাবলিশিং হাউস
৫৯, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি, এ.
শিশির পাবলিশিং হাউস,
৫৭ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীশিশিরকুম[illegible]
শিশির প্রেস,
৫৭ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উপহার

বীরুকে

এই বইখানি

স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ

উপহার

দিলাম।

শিশিরকুমার মিত্র,

২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ সাল।

ভূমিকা

চার বৎসর আগে আমরা "বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে" প্রকাশ করি। বিজ্ঞানের মত গুরুগম্ভীর বিষয় যে ছেলে মেয়েদের শুধু গল্প শুনাইয়া ও ছবি দেখাইয়া এমন সরল সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেওয়া যায় তাহা এই বইখানি প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু জন সাধারণ বইখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, বলিতে কি ইহার এই আশাতীত সাফল্যই আমাদিগকে শিশুসাহিত্য প্রণয়নে প্রলুব্ধ করিয়াছে। তখনই আমরা বুঝিয়াছিলাম তথাকথিত নিরস স্কুলপাঠ্য পুস্তকে ছেলেমেয়েদের পাঠের তৃষ্ণাত মেটেই নাই, উপরন্তু অনেক সময়ে বদহজমের কারণ হয়, পাঠে বিতৃষ্ণা জন্মে। এইরূপ গুরুগম্ভীর বিষয়ও ছেলেমেয়েরা যাহাতে আনন্দের সহিত পাঠ করে এই উদ্দেশ্যেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষণীয় নানা বিষয় চিত্র ও গল্পের মধ্য দিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত করিবার সঙ্কল্প করি। সেই সঙ্কল্পের ফলেই প্রায় একবৎসর উদ্যোগ ও আয়োজনের পর "স্বাস্থ্য চিত্রে ও গল্পে" ছাপাখানার কবল হইতে বাহির হইয়া আসিল।

স্বাস্থ্য বিষয়ক পাঠ্য পুস্তকের অভাব নাই, সত্য, কিন্তু এই বিষয়টি সুখপাঠ্য করিয়া ছেলেমেয়েদের সম্মুখে ধরিয়াছে এরূপ পুস্তক বড় একটা দেখি নাই ; তাই এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও স্বাস্থ্যের গল্প লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিই এবং বিশেষজ্ঞ বন্ধু বান্ধবদের সাহায্যে পুস্তকখানি মনের মত করিয়া শেষ করিয়াছি।

এই পুস্তক প্রণয়নের সময় যে সকল বিশেষজ্ঞ বন্ধুবান্ধব আমাকে

সাহায্য করিয়াছেন তাহাদের নিকট ;আমি কৃতজ্ঞ এবং গোড়াতেই তাহাদিগকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমার ভাই, শ্রীমান কালীপ্রসাদ ঘোষ বি, এস্. সি, "মানবের দেহ-যন্ত্র" পরিচ্ছেদটি লিখিয়াছে এবং নানা ভাবে এই পুস্তক প্রণয়নে আমায় সাহায্য করিয়াছে—সে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তাহা ছাড়া, তাহার লেখার বাঁধুনী অতি চমৎকার, সুতরাং ঐ পরিচ্ছেদটি এবং অন্যান্য ভাবে তাহার সাহায্য—যে পুস্তকের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা সুধীজন মাত্রেই পড়িয়া বুঝিবেন।

"মানবের দেহযন্ত্র" পরিচ্ছেদটি হয়ত অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের নিকট একটু কঠিন বোধ হইবে তাই উহা প্রথমেই না পড়িয়া সর্ব্বশেষে প'ড়িলে আর তেমন কঠিন বোধ হইবে না।

এই একখণ্ডেই স্বাস্থ্য বিষয়ক যাবতীয় গল্প বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল অর্দ্ধেকও বলা হইল না। তাই স্বাস্থ্য চিত্রে ও গল্পের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা আবশ্যক হইবে। জীবাণুর কোন কথা প্রথম খণ্ডে বলা হইল না—জীবাণু এবং তজ্জাত রোগাবলীর কথা দ্বিতীয় খণ্ডে বলিব।

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য শিশুপাঠ্য পুস্তকাবলি জনসাধারণ, শিক্ষক ও অভিভাবকবর্গ যেরূপ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, আশা করি এই বইখানিও তাহারা তেমনি আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন। তাহা হইলেই আমরা আমাদের সব পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি

২৮শে অগ্রহায়ণ,
সন ১৩৩০ সাল।

বিনীত
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র।

স্বাস্থ্য চিত্রে ও গল্পে।

মানবের দেহযন্ত্র।

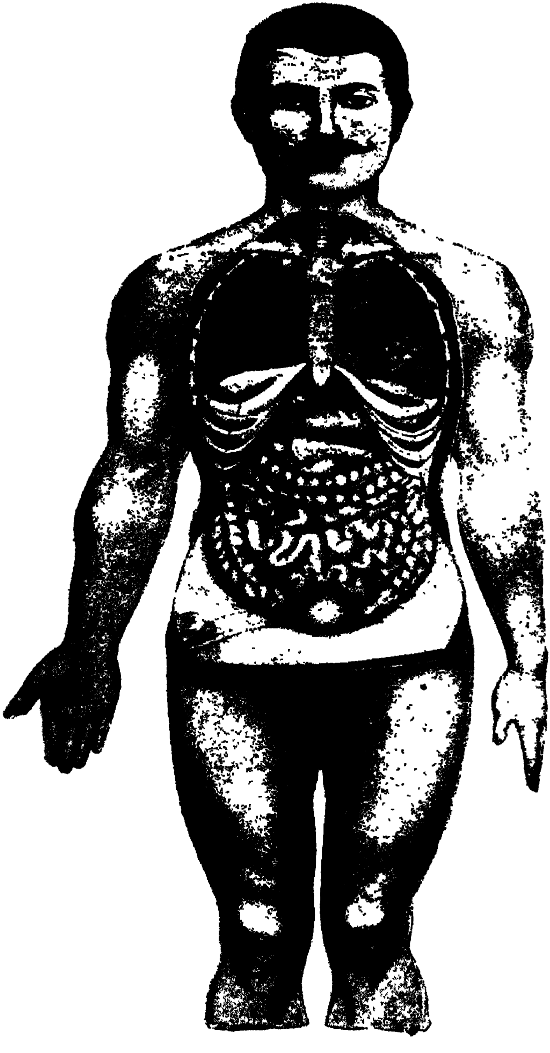
পৃথিবীতে বিস্ময়ের বস্তু অনেক আছে। কিন্তু মানব দেহের মত এত বড় একটা বিস্ময়জনক যন্ত্র, অথচ এত আপনার জিনিষ আর একটীও খুঁজিয়া পাওয়া ভার। যন্ত্রের নির্ম্মাণ কৌশলের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, মানবনির্ম্মিত সকল যন্ত্রই—তা সে রেলগাড়ীর ইঞ্জিনই হউক বা আকাশগামী এরোপ্লেনই হউক—বিধাতার দান এই দেহ-যন্ত্রের নিকট একেবারে ছেলেখেলা মনে হয়। যেখানে যে জিনিষটীর দরকার—অঙ্গগুলি যেখানে বিন্যস্ত হইলে—যে ভাবে, যে বস্তুদ্বারা নির্ম্মিত হইলে সমস্ত কার্য্য একেবারে সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ হইতে পারে তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত এমন সুচারুরূপে মানবের দেহে বর্ত্তমান যে, জগতের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার—সমস্ত বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর শেষদিন পর্য্যন্ত চেষ্টা করিলেও ইহার সমকক্ষ কোনও

যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন এরূপ দুরাশা কেহ করে না। মানবের এই দেহ যন্ত্রটীকে মানবের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে উপযোগী হইতে হইলে ইহার প্রধানতঃ দুইটী গুণ থাকা আবশ্যক। প্রথম, ইহা স্বভাবতঃ জীবিত এবং কার্য্যক্ষম থাকিবে;—এবং দ্বিতীয়তঃ, ইহা মানবের আত্মরক্ষার পক্ষে উপযোগী হইবে। মানবের বিস্ময়কর দেহ যন্ত্রটীর নির্ম্মাণে এ উভয় বন্দোবস্তই একেবারে নিখুঁত ভাবে বর্ত্তমান। সেই কথাই এখন তোমাদিগকে সংক্ষেপে বলিব।

প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে হইলে কারিকর যেমন প্রথমে কতকগুলি খড় একত্র বাঁধিয়া একটা কাঠাম তৈয়ার করিয়া লয়;—এবং তাহার পর সেই কাঠামের উপর মাটী দিয়া, রং দিয়া যেমন তাহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলে;—মানব দেহের নির্ম্মাণেও তেমনি দেখা যায় যে, অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ হাড় সাজাইয়া ইহার কাঠাম তৈয়ার হইয়াছে;—এবং সেই কাঠামের উপর মাংসপেশী, শিরা, স্নায়ু, চর্ম্ম প্রভৃতির প্রলেপ পড়িয়া ইহা একটী বিচিত্র যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

মানব দেহের কাঠাম

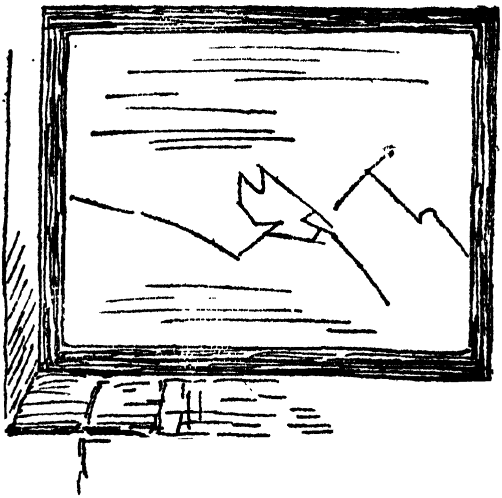
মানবদেহে সবশুদ্ধ ২০৭ খানা হাড় আছে;—মাথায় এবং মুখে আছে ২৩ খানা; হাতে পায়ে আছে ১২৬



খানা ; আর বাকি ৫৮ খানা আছে বুকে কোমরে ইত্যাদি সব জড়াইয়া। তোমরা হয়ত মনে করিতে পার যে মানবদেহের এই কাঠামটুকু গড়িতে এতগুলি হাড়ের দরকার কি ? কিন্তু দরকার সত্যই আছে। গঙ্গার ঘাটে অথবা মেলায় দুই পয়সা দামের যে কাঠের পুতুল কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিতে অনেকটা মানুষের মত বটে, কিন্তু হাজার চেষ্টা করিলেও তাহার হাত, পা, মাথা ইত্যাদি নাড়ান যায় না,—কারণ সে পুতুলের কাঠাম একখানি মাত্র কাঠ দিয়া তৈরী। আমাদের দেহযন্ত্রটী তো সেরূপ হইলে চলিবে না। তাই যাহাতে নড়াচড়া এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন নির্বিঘ্নে চলিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ইহার কাঠামটি অনেকগুলি টুকরা টুকরা হাড় সাজাইয়া তৈয়ার হইয়াছে। বাগানে বেড়া বাঁধিবার সময় যেমন বাঁকারীগুলিকে দড়ি দিয়া বাঁধা হয়, তেমনি মানব দেহের কাঠামের এই টুকরা টুকরা হাড়গুলি যাহাতে স্থানচ্যুত না হয়, সে জন্য হাড়গুলিও অস্থিবন্ধ (Ligament) দ্বারা বদ্ধ হইয়া পরস্পর সংলগ্ন থাকে।

অনেকগুলি টুকরা টুকরা হাড় হওয়ার আরও সুবিধা আছে। মনে কর, একটা জানালার শার্সি একখানা

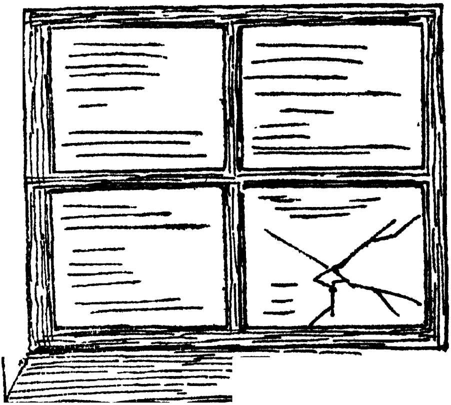
মাত্র প্রকাণ্ড কাচ দিয়া প্রস্তুত। এখন কোনও দুষ্ট ছেলে বাহির হইতে ঢিল ছুঁড়িয়া কাচটীর উপর মারিলে, একেবারে সমস্ত কাচটী ফাটিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে,—



এখন কোন দুষ্ট ছেলে বাহির হইতে ঢিল ছুঁড়িয়া কাচটির উপর মারিলে একেবারে সমস্ত কাচটি ফাটিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে—উহাকে সারাইবার আর কোন উপায় থাকিবে না।

উহাকে সারাইবার আর কোনও উপায় থাকিবে না। কিন্তু শার্শিটা যদি অনেকগুলি টুকরা টুকরা কাচ দিয়া তৈয়ার হয় তাহা হইলে সে ঢিল লাগিয়া মাত্র একখানি কাচই

ফাটিবে ;—এবং সমস্ত শার্শি টী একেবারে কাজের বাহির হইবে না ;—উহাকে সারানও তেমনি অল্পায়াসসাধ্য হইবে। ইহা হইতেই তোমরা বুঝিতে পারিবে যে মানবদেহের



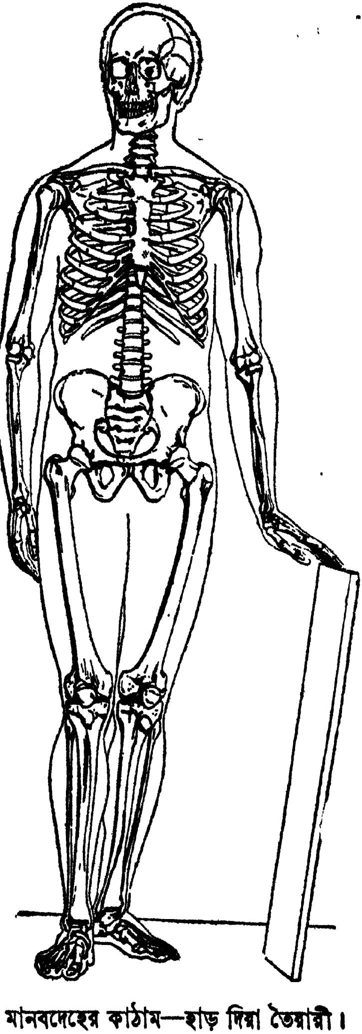
কিন্তু শার্শিটী যদি অনেকগুলি টুকরা টুকরা কাচ দিয়া তৈয়ার হয় তাহা হইলে সে ঢিল লাগিয়া মাত্র একখানা কাচই ফাটিবে ;—এবং উহাকে সারানও তেমনি সহজ হইবে।

কাঠামটী টুকরা টুকরা হাড় দিয়া তৈয়ারী হওয়াতে আত্মরক্ষার পক্ষে কতটা উপযোগী হইয়াছে।

দুইটী কঠিন জিনিষ পরস্পর অবিরত ঘষা লাগিলে দুইটীরই ক্ষয় হইতে থাকে। কিন্তু দুই টুকরা চামড়া

যা দুইখণ্ড রবারের পরস্পর ঘষা লাগিলে সেরূপ ক্ষয় হয় না। ইহার কারণ, রবার ও চামড়া বিশেষ কঠিন নয়—চাপ লাগিলে সে যায়গায় নুইয়া যায়। তেমনি খুব কঠিন জিনিষের উপর খুব জোরে ঝাঁকানি লাগিলে সে জিনিষটা যত সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, সহজে নমনীয় কোনও জিনিষের উপর খুব জোরে ঝাঁকানি লাগিলে তাহার ক্ষতি তত সহজে হয় না। একটা কড়ির পুতুল হাত হইতে পড়িয়া গেলে তাহা তখনই ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু রবারের একটা পুতুল একশোবার পড়িয়া গেলেও সেটার কিছু হয় না। আমাদের মানবদেহের কাঠামটা যদি কেবল মাত্র কঠিন হাড়ের দ্বারাই প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে আমাদেরও দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। অহোরাত্রি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনায় আমাদের শরীরের এই ২০৭ খানা হাড়ের মধ্যে যে কি সাংঘাতিক ঠোকাঠুকি আরম্ভ হইয়া যাইত, এবং পরস্পর ঘর্ষণে হাড়গুলি যে কি ভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হইত, তাহা তোমরা বেশ বুঝিতেছ। সে দুর্দ্দশা হইতে আমাদিগকে অব্যাহতি দিবার জন্য, ভগবান আমাদের দেহের কাঠামটার সবটাই অস্থিময় না করিয়া, ইহার স্থানে স্থানে খানিকটা করিয়া উপাস্থির (Cartilage)

উপাস্থি



মানবদেহের কাঠাম—হাড় দিয়া তৈয়ারী।



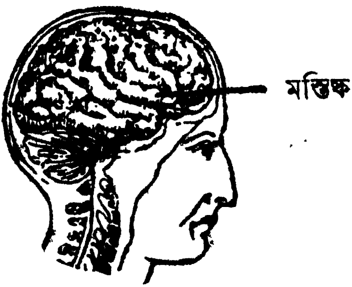
মানবদেহের অস্থিময় কাঠামকে প্রায় সর্ব্বপ্রকারে আচ্ছাদিত করিয়া
রহিয়াছে দেহের মাংসপেশীগুলি !

প্রলেপ লাগাইয়া দিয়াছেন।—এই উপাস্থি দ্রব্যটি হাড়ের মত অত কঠিন নয়; পরন্তু কতকাংশে নমনীয়। ইহার ঠিক স্বরূপ বুঝিতে হইলে, একবার কাণে হাত দিয়া দেখ;—কাণের মধ্যে যে ঈষৎ কঠিন জিনিষটি হাতে ঠেকিতেছে, তাহা হাড় নয়;—দেখিতেছ, উহা হাড়ের অপেক্ষা কত নরম, কত সহজে উহাকে নোয়ান যায়;—ইহা এক প্রকার উপাস্থি। যেখানেই দুইটা হাড় আসিয়া যুক্ত হইয়াছে,—সেই সংযোগস্থলে, গদীর মত এই উপাস্থির একটা করিয়া পুরু প্রলেপ আছে।—মেরুদণ্ডের প্রত্যেকটি ছোট হাড় জোড়ার মধ্যে এই উপাস্থির গদী বর্ত্তমান। তাই সহস্রবার হস্ত পদাদি সঞ্চালন করিলেও ঘর্ষণে ঘর্ষণে শরীরের হাড়গুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার সম্ভবনা নাই;—তাই শক্ত ঝাঁকানি লাগিলেও হাড়গুলির ঠোকাঠুকি হইবার ভয় নাই। ফুটবল খেলিবার মাঠে খেলোয়াড় যখন সজোরে "শুট্" করে, তখন এই উপাস্থি আছে বলিয়াই তাহার পায়ের হাড়গুলি কড়্ কড়্ করিয়া উঠে না;—বাজী রাখিয়া যখন কোনও ডান্‌পিটে ছেলে দোতলার ছাদ হইতে নীচে লাফাইয়া পড়ে, তখন এই উপাস্থি আছে বলিয়াই তাহার মেরুদণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাড়গুলি ঝাঁকানি লাগিয়া মড়্ মড়্ করিয়া ভাঙ্গিয়া যায় না।

রহিয়াছে—শুধু একটিমাত্র উত্তেজনার অপেক্ষা। কিন্তু সে উত্তেজনা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মাংসপেশীতে পৌঁছিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে মাংসপেশী একেবারে নিথর—একটি স্পন্দনও তাহাতে দৃষ্ট হইবে না।

মস্তিষ্ক

এ উত্তেজনা আসে কোথা হইতে? মাংসপেশীর এ সেনাপতি কোথায়? ইহার উত্তর—মানবের মস্তিষ্ক। এই যে আমাদের এত সাধের মস্তক—ছেলেবেলায় পড়া বলিতে না পারিলে গুরুমহাশয় যেটাকে দুই হাতে নাড়া দিয়া তাহার মধ্যে ঘীলু আছে কি গোবর আছে সন্দেহ প্রকাশ



মস্তিষ্ক কোথায় থাকে, এই চিত্রে তাহা দেখান গেল।

করিতেন—সেই কঠোর অস্থিময় খুলির মধ্যে এক ধূসরবর্ণ (Grey matter) নরম পদার্থ আছে,—তাহাই

আমাদের মস্তিষ্ক। ইহাকেই আমরা চলিত কথায় ঘীলু বলি। এবং ইহাই আমাদের মাংসপেশীর সেনাপতি। শুধু মাংসপেশীর কেন, মানবদেহের সমস্ত কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহের কেন্দ্র হইতেছে,—এই মস্তিষ্ক। অঙ্গ সঞ্চালন, নিশ্বাস প্রশ্বাস, ঘর্ম্মত্যাগ, খাদ্য পরিপাক করিবার জন্য রসোৎপাদন প্রভৃতি সমস্তই এই মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত উত্তেজনা দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। মাত্র কয়েকটী বাছা বাছা লোক লইয়া সৃষ্ট গবর্ণমেণ্ট যেমন সুবৃহৎ দেশ শাসন করেন, কতকগুলি স্নায়ুকোষের (nerve cell) সমষ্টি মস্তিষ্ক তেমনি মানবদেহের সমস্ত কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করে।

কিন্তু মস্তিষ্কে উদ্ভূত এই উত্তেজনা শরীরের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছিবার জন্য শরীরের প্রত্যেক অংশের সহিত মস্তিষ্কের একটি সংযোগ তো থাকা চাই। শরীর মধ্যস্থ

স্নায়ু

অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুগুলিই শরীরের বিভিন্ন অংশের সহিত মস্তিষ্কের এই সংযোগ সাধন করিতেছে। ধরিতে গেলে মানবদেহের এই স্নায়ুগুলি যেন মানবদেহের টেলিগ্রাফের তার। শিমলার পাহাড়ের উপর অথবা দিল্লীর রাজদরবারে বসিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট যে মতলব আঁটিলেন, তাহা

যেমন তাঁহারা টেলিগ্রাফের তারের মধ্য দিয়া সারা ভারতের অধস্তন রাজকর্ম্মচারীদের গোচর করিয়া সমস্ত রাজকার্য্য নিয়ন্ত্রিত করেন, তেমনি মানবের মস্তিষ্কে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তাহা অমনি তাহার স্নায়ুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মানবদেহের প্রতি নিভৃত ক্ষুদ্র অংশটুকুতে পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় এবং তাহার কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করে।

শুধু তাই নয়;—গবর্ণমেণ্টের রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলে চালাইবার জন্য সমস্ত দেশটার সমস্ত খবর যেমন তাঁহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা দরকার,—এবং সে সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য যেমন

ইন্দ্রিয়।

সারা দেশময়, বিশেষতঃ সীমান্ত-প্রদেশে, গবর্ণমেণ্টের অনেক গোয়েন্দার আড্ডা আছে, আমাদের শরীরের কার্য্যও তেমনি সুশৃঙ্খলে চালাইবার জন্য আমাদের শরীরের প্রত্যেক অংশের প্রত্যেক খুঁটিনাটি খবর আমাদের মস্তিষ্কের নিকট পোঁছান দরকার,—এবং সে সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য মানবদেহের প্রতি স্থানেই তেমনি অসংখ্য গোয়েন্দার আড্ডা আছে। এই গোয়েন্দার আড্ডাগুলিই মানবদেহের ইন্দ্রিয়। ইহার মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ ও

নাসা—এই তিনটি প্রধান গোয়েন্দার আড্ডা।—ইহা ছাড়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোয়েন্দার আড্ডা—স্পর্শেনেন্দ্রিয় স্বাদেন্দ্রিয় ইত্যাদি—বিস্তৃতভাবে সারা শরীরের মধ্যে বর্ত্তমান। এই সমস্ত গোয়েন্দা বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগতের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া স্নায়ুর মারফৎ মস্তিষ্কে প্রেরণ করে,—আর সেই জন্যই মশাটী কামড়াইলেও যেমন মস্তিষ্ক তাহা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারে,—পেটে ক্ষুধা লাগিলেও তেমনি সে সংবাদটী মস্তিষ্কে পৌঁছিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। কত যে বিচার করিয়া এই গোয়েন্দার আড্ডাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা শরীরের নানাস্থানে ইহাদের অবস্থিতি স্থানটুকু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যে, মানুষের প্রধান তিনটী ইন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা যদি মুণ্ডে অবস্থিত না হইয়া পায়ের গোড়ালীর কাছে থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগকে পদে পদে কিরূপ অসুবিধায় পড়িতে হইত—মানুষের আত্মরক্ষার পক্ষে তাহা কতটা অনুপযোগী হইত? যুদ্ধক্ষেত্রে চারিপাশের শত্রুসেনার গতিবিধি ও অবস্থান জানিবার জন্য সেনাদলের গোয়েন্দারা খুব উঁচু গাছের ডগায় আরোহণ করে—আজকালকার উন্নত বৈজ্ঞানিক যুগে, এরোপ্লেনে চড়িয়াও

গোয়েন্দারা সংবাদ সংগ্রহ করে ;—ইহার কারণ, উঁচু জায়গা হইতে চারিপাশের অবস্থার কথা জানা যত সহজ, নিচু স্থান হইতে তাহার শতাংশের এক অংশও নয়। মানব দেহটীকেও তেমনি সর্ব্বাংশে আত্মরক্ষার উপযোগী করিবার জন্যই স্রষ্টা ইহার প্রধান গোয়েন্দার আড্ডা-কয়টীর স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শরীরের সর্ব্বোচ্চ অংশে—মুখমণ্ডলে।

রক্ত ও রক্তনালী।

অস্থি, উপাস্থি, মাংসপেশী, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা তোমাদিগকে বলিলাম,—মানবদেহটিকে কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য এ গুলি যে অপরিহার্য্য তাহাও তোমাদিগকে বলিয়াছি। কিন্তু এই অভিনব দেহ যন্ত্রটীর প্রত্যেকটী অংশ যাহাতে জীবিত ও কার্য্যক্ষম থাকিতে পারে, সেজন্য ইহার তো খোরাক আবশ্যক! প্রকৃতির নিয়মে প্রতিমুহূর্ত্তেই সকল জিনিষের ক্ষয় হইতেছে—মেরামত না করিলে, আজ যে বাড়ী তুমি নির্ম্মাণ করিলে, কয়েক বৎসর পরে তাহার আর সে চেহারা দেখিবে না ;—শুধু বাড়ী কেন,—কলকারখানা জাহাজ নৌকা প্রভৃতি যে জিনিষই হউক না কেন মেরামত না করিলে কিছুই আর পূর্ব্বের ন্যায়

কার্য্যোপযোগী থাকে না। মানবের অভিনব দেহযন্ত্রটীর সম্বন্ধেও প্রকৃতির এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ব্যবহারে এবং অব্যবহারে এই প্রকারে মানবদেহের প্রতিনিয়ত যে ক্ষয় সাধিত হইতেছে, শুধু যে তাহারই পূরণ একান্ত আবশ্যক তাহা নহে। কল চালাইতে হইলে, শুধু কলের জীর্ণ সংস্কারই যেমন পর্য্যাপ্ত নয়,—কল চালাইবার শক্তির জন্য যেমন কয়লাও পুড়াইতে হয়;—তেমনি আমাদের দেহযন্ত্রটীর নিকট হইতেও কাজ আদায় করিতে হইলে শুধু ইহার ক্ষয় পূরণ করিলেই চলিবে না;—ইহার প্রতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশটীতে পর্য্যন্ত শক্তি যোগাইতে হইবে। কিন্তু ভাবনার কথা এই যে, দেহ যন্ত্রটীর এই জীর্ণ সংস্কারের মাল মশলা এবং এই শক্তি উৎপাদনের উপযোগী খোরাক ইহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশে পৌঁছিবে কি প্রকারে? প্রতি মাংসপেশী, প্রতি অস্থিখণ্ড প্রতি স্নায়ুর অভ্যন্তরে যে ক্ষয় হইতেছে, সেখানে পৌঁছান তো সহজ ব্যাপার নয়।—তাহার পথই বা কোথায়?

এই উদ্দেশ্যেই—এই অভাব পূরণের জন্যই রক্ত ও রক্তনালীর সৃষ্টি। যেমন করিয়া এই বিপুল কলিকাতা সহরের প্রতি পাড়ায় পাড়ায়, প্রতি গৃহে গৃহে কলের

জল সরবরাহ হয়, ঠিক তেমনি করিয়াই মানবদেহের প্রতি নিভৃত অংশে অস্থি, উপাস্থি, মাংসপেশী, মস্তিষ্ক, স্নায়ু ইন্দ্রিয় প্রভৃতির প্রতি ক্ষুদ্রতম অংশে পর্য্যন্ত রক্ত সঞ্চালিত হয়। টালার জল-পূর্ণ ট্যাঙ্ক গুলি হইতে যেমন প্রথমে এক বিরাট জলবাহী নল বাহির হইয়া কিছুদূর যাইতে না যাইতেই কয়েকটী অপেক্ষাকৃত সরু নলে বিভক্ত হইয়া সহরের বড় বড় রাস্তাগুলি ধরিয়া চলিয়া গিয়াছে,—তারপর বড় রাস্তার এই এক একটা নল হইতে অসংখ্য সূক্ষ্মতর নল বাহির হইয়া দুই পাশের ছোট ছোট রাস্তায় প্রবেশ করিয়াছে ;—এবং এইভাবে যেমন পরিশেষে প্রত্যেক গলির নল হইতে এক একটী সরু সরু নল প্রত্যেক বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহার কলগুলির মুখ পর্য্যন্ত জল আগাইয়া দিতেছে ;—মানবদেহের রক্ত প্রবাহও তেমনি প্রথমে এক স্থূল রক্ত নালীতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মতর রক্ত নালীর মধ্য দিয়া গিয়া অবশেষে অসংখ্য এত সূক্ষ্ম রক্তনালীতে প্রবাহিত হইতেছে, যে সে সকল রক্তনালী কেবল মাত্র অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা যায়। সূক্ষ্মতম রক্ত-নালীগুলিকে কৈশিক রক্তনালী (Capillary blood-vessels) বলে ; আর তদপেক্ষা স্থূলতর রক্তনালীগুলিকে

ধমনা বলে (arteries and arterioles)। সরবতে যেমন মিষ্ট ইত্যাদি গোলা থাকে, এই সকল ধমনী ও কৈশিক রক্তনালীর মধ্যস্থিত রক্তেও তেমনি শরীরযন্ত্রের জীর্ণ-সংস্কারের উপযোগী মালমশলা এবং শক্তি উৎপাদনের উপযোগী খোরাক গোলা থাকে। তবেই বুঝিলে রক্ত মানুষের পক্ষে কিরূপ অপরিহার্য্য। রক্ত যে শুধুই এই দুই কার্য্য করে, তাহা নহে—রক্তের আরও অনেক উপকারিতা আছে। তাহার মধ্যে প্রধান দুইটী। প্রথম, রক্তই মানবদেহের আবর্জ্জনা বহিয়া লইয়া পয়ঃপ্রণালীর কার্য্য করে; দ্বিতীয়, রক্ত শরীরের শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করে। সে সব কথা তোমাদিগকে পরে বলিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আর একটা দেখা যাউক। আচ্ছা, ধমনীর মধ্য দিয়া যে রক্ত কৈশিক রক্তনালীগুলির মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিল;—সে রক্তের সবটাই তো আর দেহ যন্ত্রের প্রয়োজনে খরচ হইল না।—তবে বাকিটা কোথায় গেল?—এ প্রশ্নের উত্তর দিবার আগে কলিকাতা সহরের জল সরবরাহের অবস্থাটা আর একবার বিবেচনা করা যাউক। যত জল কল হইতে আইসে তাহার কিয়দংশ আমরা খাইয়া ফেলি—কিয়দংশ বা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়;—কিন্তু অধিকাংশ জলই নর্দ্দমা বাহিয়া রাস্তার নীচের

ড্রেণ বাহিয়া অবশেষে গঙ্গায় যাইয়া পড়ে। এই ড্রেণের পাইপগুলি রাস্তার নীচে দিয়া যাইবার সময়, যে জলের নল বাড়ীর দিকে আসিয়াছে, তাহাদেরই পাশ দিয়া গিয়াছে। এই ভাবে নর্দ্দমার জল গঙ্গায় পড়ে,—আবার গঙ্গা হইতে সেই জল পাম্প করিয়া তুলিয়া—পরিষ্কার করা হয়, তারপর আবার সেই জল টালার ট্যাঙ্কে ভরা হয় —আবার তাহা নল বাহিয়া বাড়ীতে বাড়ীতে আসে। মানবদেহের রক্তের সম্বন্ধেও ঠিক একই ব্যবস্থা। কৈশিক রক্তনালীর মধ্য দিয়া যে রক্ত শরীরের ক্ষুদ্রতম অংশগুলিতে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহার কিয়দংশ শরীরের প্রয়োজনে লাগিল, কিন্তু অধিকাংশ রক্তই পুনরায় আর একদফা রক্তনালী দিয়া চলিয়া যায়। এই নূতন দফা রক্তপ্রণালীকে শিরা বলে। এই শিরাগুলিও প্রথমতঃ সংখ্যায় যেমন অসংখ্য পরিধিতে তেমনি সরু;—কিন্তু ধমনীগুলির পাশ দিয়া যাইতে যাইতে ক্রমে ক্রমে ইহারা সংখ্যায় যেমন একদিকে কমিতে থাকে পরিধিতে তেমনি বাড়িতে থাকে, এবং অবশেষে একটি অতিস্থূল শিরায় পরিণত হইয়া হৃৎপিণ্ডে আসিয়া শেষ হয়। এই হৃৎপিণ্ড জিনিষটী যে কি, তাহা কি তোমরা জান? মোটামুটী ধরিতে গেলে, হৃৎপিণ্ড

হইতেছে পাশাপাশি অবস্থিত একজোড়া পাম্প। যেমন একই দেওয়ালের দুই দিকে দুইখানি ঘর থাকিতে পারে অথচ তাহাদের মধ্যে কোনও সংযোগ নাও থাকিতে পারে হৃৎপিণ্ডের দুইটী পাম্পও তেমনি একই দেওয়ালের দুই পাশে অবস্থিত; কিন্তু পাম্পদুইটির মধ্যে কোনও সংযোগ নাই। একটি পাম্প ডান দিকে অবস্থিত, অপরটি বাঁ দিকে। শিরা দিয়া যে রক্ত হৃৎপিণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা এই ডানদিকের পাম্পে আসিয়া পড়ে,—বাঁদিকে যায় না।

হৃৎপিণ্ড

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিরা দিয়া যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাহা ধমনীর রক্ত বা কৈশিক রক্তনালীর রক্ত হইতে কিছু বিভিন্ন ধরণের। কেন না, কৈশিক রক্তনালী হইতে রক্ত শিরায় আসিবার পূর্ব্বে যেমন দেহযন্ত্রের প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য ইহা হইতে বাদ পড়িয়াছে, তেমনি শরীরের অনেক আবর্জ্জনা আবার ইহার সহিত মিশিয়াছে। শিরায় প্রবাহিত রক্তে যে যে জিনিষ বাদ পড়িল তাহার মধ্যে অক্সিজেন নামক গ্যাস একটী প্রধান;—আর আবর্জ্জনা যাহা আসিয়া মিলিল, তাহা প্রধানতঃ কার্ব্বন ডাইওক্সাইড নামক আর একপ্রকার গ্যাস। এই অক্সিজেন গ্যাস শরীরের পক্ষে এত প্রয়ো-

জনীয় যে, ইহার বিহনে মানুষ তিন মিনিটও বাঁচিয়া থাকিতে পারে না ;—আর এই কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস অতি অল্প মাত্রায় শরীরের পক্ষে উপকারী বটে, কিন্তু সামান্ত একটু মাত্রাধিক্য হইলেই ইহা শরীরের মহা অনিষ্ট করে। কাজেই দেখা যাইতেছে, শিরায় প্রবাহিত রক্ত শরীরের পক্ষে মোটেই উপকারী নয়। নর্দ্দামার জল যেমন সংশোধিত না হইলে আর কোনও কাজে লাগে না, শিরায় প্রবাহিত রক্তও তেমনি শোধিত না হইলে শরীরের কোনও কাজে লাগে না। শিরার এই রক্তশোধনের কারখানা হইতেছে ফুস্‌ফুস। শিরা বাহিয়া অক্সিজেন-হীন এবং কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইড-পূর্ণ রক্ত যেই হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণদিকের পাম্পে আসিয়া পড়ে, অমনি হৃৎপিণ্ড উহা পাম্প করিয়া সেই রক্ত কতকগুলি রক্তনালীর মধ্য দিয়া ফুস্ ফুসে চালান করে। ফুস্‌ফুসে আসিয়া এই রক্ত ফুস্‌ফুস্ হইতে নূতন অক্সিজেন গ্যাস বোঝাই করিয়া লয়, এবং কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের বোঝা ফুস্‌ফুসের ঘাড়ে চাপাইয়া দেয়। এইরূপে শোধিত রক্ত ফুস্‌ফুস্ হইতে বাহির হইয়া অন্য কতকগুলি রক্তনালীর মধ্য দিয়া একেবারে হৃৎপিণ্ডের বামদিকের পাম্পে গিয়া হাজির হয়। এই

শোধিত রক্ত শরীরের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই হৃৎপিণ্ডের বামদিকের পাম্পটী তখন সবেগে পাম্প করিয়া এই শোধিত রক্ত শরীরের প্রধান ধমনীতে নিক্ষেপ করে; এবং তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে সে রক্ত শরীরের সকল ধমনীতে এবং পরিশেষে সকল কৈশিক রক্ত নালীতে প্রবাহিত হয়। এইরূপে একই রক্ত শোধিত অবস্থায় ধমনী এবং কৈশিক রক্তনালী দিয়া এবং অশোধিত অবস্থায় শিরার মধ্য দিয়া অহর্নিশি চক্রাকারে প্রবাহিত হইতেছে। হৃৎপিণ্ড মানবের যে এত উপকারী তাহার কারণ শুধু এই যে, অবিশ্রাম পাম্প করিয়া হৃৎপিণ্ড এই রক্তের প্রবাহ অব্যাহত রাখিয়াছে। তোমা-দিগকে পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি যে হৃৎপিণ্ড মাংসপেশী-দ্বারা গঠিত। এই মাংশপেশীর প্রধান কর্ম্মই হইতেছে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হওয়া—এই ধর্ম্মের বলেই হৃৎপিণ্ডের পাম্পের কার্য্য অক্লান্তভাবে চলিতেছে! যদি কোনও কারণে হৃৎপিণ্ডের এই স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়—তবে রক্ত চলাচলও সেই মুহূর্ত্তে বন্ধ হইয়া যাইবে, কৈশিক রক্ত নালীতে যে রক্ত আছে, সে রক্ত কয়েক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যেই অক্সিজেন-হীন এবং কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড পূর্ণ হইয়া দূষিত হইবে, কিন্তু সে দূষিত রক্ত শিরায় সঞ্চালিত হইয়া

তৎস্থানে শোধিত রক্ত আসিতে পারিবে না ;—সুতরাং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মৃত্যু অনিবার্য্য। ব্যায়াম ও অঙ্গ সঞ্চালনে রক্ত নালীর উপর মাংসপেশীর চাপ পড়িয়া রক্ত চলাচল বাড়িয়া যায়—সেই জন্যই ব্যায়াম স্বাস্থ্যের পক্ষে এত উপকারী।

একটু আগে ফুস্‌ফুসের কথা তোমাদিগের নিকট উল্লেখ করিয়াছি। শিরার মধ্যস্থিত দূষিত রক্ত শোধন করিবার জন্যই যে এই কারখানার সৃষ্টি তাহাও তোমাদিগকে বলিয়াছি

ফুস্‌ফুস্

কিন্তু এই রক্তশুদ্ধি কি প্রকারে সম্পন্ন হয় তাহার সম্বন্ধে কিছুই তোমাদিগকে বলা হয় নাই। মানবদেহে বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের দুইধারে দুইটী ফুস্‌ফুস্ আছে। ইহার প্রত্যেকটীকে বায়ুপূর্ণ এক একটি থলি বলা চলে। প্রত্যেকটী ফুস্‌ফুস্ হইতে একটী নল বাহির হইয়া আসিয়া একত্র মিলিয়াছে এবং এইরূপে শ্বাসনালীর (trachea) সৃষ্টি করিয়াছে। গলার ঠিক সামনে হাত দিলেই চামড়ার নীচেই যে মোটা নলটী হাতে ঠেকে উহাই শ্বাসনালী। এই শ্বাসনালী মুখে আসিয়া শেষ হইয়াছে ; এবং এইরূপে বাহিরে বায়ু-মণ্ডলের সহিত ফুস্‌ফুসের ভিতরের বায়ুর সংযোগ সাধন করিতেছে। তোমরা জান

বোধ হয় যে আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ এই বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন-গ্যাস প্রচুর পরিমাণে আছে ;—আর তাহার তুলনায় কার্ব্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস অতি অল্প পরিমাণে আছে। এখন, প্রত্যেকবার নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসের মধ্যস্থিত বায়ু একবার করিয়া বাহিরের নির্ম্মল বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইতেছে ;—এবং এই মিশ্রণের ফলে ফুস্‌ফুসের মধ্যেও অক্সিজেনের পরিমাণ খুব বেশী এবং কার্ব্বনডাইওক্সাইডের পরিমাণ খুব কম থাকে। সুতরাং হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অংশ হইতে যে অক্সিজেন-হীন ও কার্ব্বনডাইওক্সাইডপূর্ণ রক্ত ফুস্‌ফুসে পাঠান হয়, সে রক্ত ফুস্‌ফুসের মধ্যস্থিত বায়ু হইতে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন্‌ও যেমন আত্মসাৎ করিতে পারে, ফুস্‌ফুসের নিকট কার্ব্বন ডাইওক্সাইডের বোঝাও তেমনি অনেকটা পরিমাণে হাল্কা করিতে পারে। এইরূপে দূষিত রক্ত শোধিত হয়, কিন্তু ফুস্‌ফুস মধ্যস্থ বায়ু কিয়ৎ পরিমাণে দূষিত হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাসের ফলে অনতিবিলম্বেই কিন্তু ফুসফুসের বায়ু চারিপাশের বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইতে পাইয়া আবার বিশুদ্ধ হয়। এইবার বোধ হয় তোমরা বুঝিতেছ, কেন বিশুদ্ধ বায়ু সেবন মানুষের পক্ষে এত আবশ্যক।

বায়ু যদি বিশুদ্ধ না হয়, অর্থাৎ যদি তাহাতে

তৎস্থানে শোধিত রক্ত আসিতে পারিবে না ;—সুতরাং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মৃত্যু অনিবার্য্য। ব্যায়াম ও অঙ্গ সঞ্চালনে রক্ত নালীর উপর মাংসপেশীর চাপ পড়িয়া রক্ত চলাচল বাড়িয়া যায়—সেই জন্যই ব্যায়াম স্বাস্থ্যের পক্ষে এত উপকারী।

ফুস্‌ফুস্

একটু আগে ফুস্‌ফুসের কথা তোমাদিগের নিকট উল্লেখ করিয়াছি। শিরার মধ্যস্থিত দূষিত রক্ত শোধন করিবার জন্যই যে এই কারখানার সৃষ্টি তাহাও তোমাদিগকে বলিয়াছি কিন্তু এই রক্তশুদ্ধি কি প্রকারে সম্পন্ন হয় তাহার সম্বন্ধে কিছুই তোমাদিগকে বলা হয় নাই। মানবদেহে বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের দুইধারে দুইটী ফুস্‌ফুস্ আছে। ইহার প্রত্যেকটীকে বায়ুপূর্ণ এক একটি থলি বলা চলে। প্রত্যেকটী ফুস্‌ফুস্ হইতে একটী নল বাহির হইয়া আসিয়া একত্র মিলিয়াছে এবং এইরূপে শ্বাসনালীর (trachea) সৃষ্টি করিয়াছে। গলার ঠিক সামনে হাত দিলেই চামড়ার নীচেই যে মোটা নলটী হাতে ঠেকে উহাই শ্বাসনালী। এই শ্বাসনালী মুখে আসিয়া শেষ হইয়াছে ; এবং এইরূপে বাহিরে বায়ু-মণ্ডলের সহিত ফুস্‌ফুসের ভিতরের বায়ুর সংযোগ সাধন করিতেছে। তোমরা জান

বোধ হয় যে আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ এই বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন-গ্যাস প্রচুর পরিমাণে আছে ;—আর তাহার তুলনায় কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস অতি অল্প পরিমাণে আছে। এখন, প্রত্যেকবার নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসের মধ্যস্থিত বায়ু একবার করিয়া বাহিরের নির্ম্মল বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইতেছে ;—এবং এই মিশ্রণের ফলে ফুস্‌ফুসের মধ্যেও অক্সিজেনের পরিমাণ খুব বেশী এবং কার্ব্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ খুব কম থাকে। সুতরাং হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অংশ হইতে যে অক্সিজেন-হীন ও কার্ব্বনডাইঅক্সাইডপূর্ণ রক্ত ফুস্‌ফুসে পাঠান হয়, সে রক্ত ফুস্‌ফুসের মধ্যস্থিত বায়ু হইতে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন্‌ও যেমন আত্মসাৎ করিতে পারে, ফুস্‌ফুসের নিকট কার্ব্বন ডাইঅক্সাইডের বোঝাও তেমনি অনেকটা পরিমাণে হাল্কা করিতে পারে। এইরূপে দূষিত রক্ত শোধিত হয়, কিন্তু ফুস্‌ফুস মধ্যস্থ বায়ু কিয়ৎ পরিমাণে দূষিত হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাসের ফলে অনতিবিলম্বেই কিন্তু ফুসফুসের বায়ু চারিপাশের বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইতে পাইয়া আবার বিশুদ্ধ হয়। এইবার বোধ হয় তোমরা বুঝিতেছ, কেন বিশুদ্ধ বায়ু সেবন মানুষের পক্ষে এত আবশ্যক।

বায়ু যদি বিশুদ্ধ না হয়, অর্থাৎ যদি তাহাতে

অক্সিজেন যথেষ্ট পরিমাণে না থাকে বা কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ খুব কম না হয়,—তাহা হইলে ফুসফুসের মধ্যস্থিত বায়ুও অনতি বিলম্বে দূষিত হইয়া পড়িবে,—ফলে রক্ত শুদ্ধ হইতে না পারায় মৃত্যু অনিবার্য্য। এই জন্যই রাত্রে শয়নকালে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শোওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১০ ফুট লম্বা ১০ ফুট চওড়া ১০ ফুট উচ্চ একটা ঘরে যতটা হাওয়া ধরে একজন মানুষের পক্ষে প্রতি ঘণ্টায় অন্ততঃ ততখানি করিয়া বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন।

রক্তের প্রয়োজনীয়তা, প্রবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু কিছু তোমাদিগকে বলিয়াছি। কিন্তু রক্ত সম্বন্ধে বলিবার কথা এখনও ঢের বাকী আছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সব কথা বলিবার স্থান নাই। তবে গোটা কতক মোটা কথা, যাহা সকলের জানা উচিত, তাহাই বলিয়া রক্ত সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রক্তে শরীরের খোরাক গোলা থাকে। কিন্তু ইহা ছাড়াও রক্তে এমন কতকগুলি জিনিষ থাকে যাহাকে খোরাক কোনও মতে বলা চলে না;—

শ্বেত কণিকা ও লোহিত কণিকা।

অথচ শরীরের পক্ষে তাহা একটুও কম প্রয়োজনীয় নয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া এক বিন্দু রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, রক্তের তরল ভাগের মধ্যে অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র কণিকাবৎ পদার্থ অবিমিশ্রিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। আরও মনোযোগ সহকারে দেখিলে দেখা যায় যে, এই কণিকা গুলির মধ্যে আবার দুই রকম কণিকা আছে—এক রকম ঈষৎ লোহিতাভ বা হরিদ্রাভ,—আকারটা মোটরকারের চাকার মতন ;—রক্তে ইহাদের সংখ্যাই খুব বেশী, ইহাদিগকে লোহিত কণিকা বলে—আর এক রকম অপেক্ষাকৃত বড় এবং সাদা—ইহাদের কোনও বিশেষ আকৃতি নাই—ছোট ছোট পোকার ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করে, সংখ্যায়ও ইহারা অপেক্ষাকৃত অনেক কম—এইগুলিকে শ্বেত কণিকা বলে। শুধু চোখে ইহাদের কাহাকেও দেখা যায় না। ইহারা যে কত ছোট এবং সংখ্যায় কত অধিক তাহা বুঝাইবার জন্য শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এক বিন্দু (এক কিউবিক মিলিমিটার) রক্তে লোহিত কণিকাই ৫০ লক্ষ আছে। এই দুই জাতীয় রক্তকণিকাই শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রক্তই শরীরের প্রত্যেক অংশে অক্সিজেন সরবরাহ করে; কিন্তু রক্তের

কোন অংশ যে এ কার্য্য করে তাহা তোমাদিগকে বলিবার অবকাশ পাই নাই—রক্তের মধ্যস্থিত লোহিত কণিকা-গুলিই প্রধানতঃ এই কার্য্য করে। শ্বেত কণিকাদের কার্য্য কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এক কথায় উহাদিগকে শরীরের সৈনিক বলা চলে। শরীরের মধ্যে যখনই কোনও অনিষ্টকর জীবাণু প্রবেশ করে তখনই এই শ্বেত কণিকা-গুলি তাহাদের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে মারিয়া খাইয়া ফেলে। এইরূপে বায়ুমণ্ডলস্থ কোটী কোটী জীবাণুর মধ্যে থাকিয়াও আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারি। কিন্তু যদি অনিষ্টকর জীবাণুগুলি সংখ্যায় এত অধিক হয় যে, রক্তের মধ্যস্থিত শ্বেতকণিকাগুলি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে হারিয়া যায়, তবে শ্বেত কণিকাগুলিই মারা পড়ে—এবং মানুষ রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

রক্তের কণিকাদিগের কথা তোমাদিগকে বলিলাম;—কিন্তু একটা কথা এখনও তোমাদিগকে বলা হয় নাই। রক্তের মধ্যে শরীরের উপযোগী খোরাক সব থাকে, একথা বারবার বলিয়াছি—কিন্তু রক্তের মধ্যে এ খোরাক আসে কোথা হইতে? রক্ত ত আর কল্পতরু নয় যে, অফুরান্ত খাদ্যের ভাণ্ডার লইয়া বসিয়া আছে! অবশ্যই রক্তের মধ্যে এ

পাক-যন্ত্র

খোরাকের সংস্থান হয়—আমরা যে ভাত ডাল ইত্যাদি খাই তাহা হইতেই। সে কথা তোমাদিগকে না বলিলেও চলে। কিন্তু ভাত, ডাল বা মাছ ঘির সার অংশ রক্তের মধ্যে পৌঁছায় কি প্রকারে সে কথাটা জানা দরকার। মোটামুটী তোমরা সকলেই জান যে, আমরা মুখ দিয়া যে সকল খাদ্য খাই তাহা পেটের মধ্যে গিয়া হজম হয়—তাহার পর তাহার মধ্যে যেটুকু সার পদার্থ থাকে তাহা রক্তের সহিত মিশে, আর অনাবশ্যক অংশ মলদ্বার দিয়া মলের সহিত বাহির হইয়া যায়। এই মোটা কথাটার মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে। কিন্তু এই ব্যাপারটাই আর একটু পরিষ্কার করিয়া বোঝা দরকার। প্রথমে, "হজম" কথাটার মানে কি? হজমের মানেই হইতেছে এই যে, আমরা যে সব ভাত ডাল ইত্যাদি খাই সেগুলো সেই অবস্থায় রক্তে মিশিয়া যাইবার উপযুক্ত নয়,—তাই সে গুলোকে ভেঙ্গে চুরে ছোট করে' গুলে এমন অবস্থায় এনে ফেলা হয় যখন সেগুলো সহজেই রক্তনালীর মধ্যে ঢুকতে পারে এবং তা দিয়ে শরীরের প্রয়োজনীয় সব উপাদান যোগান যেতে পারে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানবদেহের যে অঙ্গগুলির সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলোকে পাকযন্ত্র বলা চলে। বুঝিবার সুবিধার জন্য এই পাক-

যন্ত্রকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করা চলে। মুখ এবং গলনালী (oesophagus) ব্যতীত পাকযন্ত্রের আর সকল অংশগুলিই পেটের (abdomen) মধ্যে স্থাপিত।

পাকযন্ত্রের প্রথম অংশ মুখ। এইখানেই প্রথম খাদ্য প্রবেশ করে, এবং লালার সহিত মিশ্রিত হয়;—এই মিশ্রণ ভাল হইলে হজমের অনেকটা সুবিধা হয়। কিন্তু খাদ্যকে লালামিশ্রিত করার চেয়েও অনেক বেশী প্রয়োজনীয় একটী কার্য্য মুখের দ্বারা সম্পন্ন হয়। আমি খাদ্য চর্ব্বণের কথা বলিতেছি। খাদ্য হজমের পক্ষে চর্ব্বণ একেবারে অত্যাবশ্যক; কারণ খাদ্যের বড় বড় শক্ত শক্ত ডেলাগুলি চর্ব্বণ দ্বারা গুঁড়া না হইলে, হজমী রস তাহার মধ্যে ঢুকিবেই বা কি প্রকারে, আর তাহা হজমই বা করিবে কি প্রকারে? এই চর্ব্বণ কার্য্য সুশৃঙ্খলে যাহাতে সাধিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে ভগবান মানুষের মুখের মধ্যে জাঁতার পাথরের মত দুইপাটী করিয়া দাঁতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দাঁতকে মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া না রাখিলে দাঁতগুলি অকেজো হইয়া পড়ে, এবং নানা অনর্থের সৃষ্টি করে।

মুখ

মুখ হইতে খাদ্যের ডেলা গলনালী বাহিয়া একেবারে

পাকস্থলীতেই গিয়া পড়ে। এই পাকস্থলীতে খাদ্য অনেকক্ষণ থাকে। জিভ দিয়া যেমন লালা নিঃসৃত হয়, পাকস্থলীর গা দিয়াও তেমনি এক প্রকার হজমী রস নিঃসৃত হয়। হজমী রসের সাহায্যে পাকস্থলীস্থ খাদ্য ধীরে ধীরে হজম হইতে থাকে। কিন্তু পাকস্থলীতে হজমের কার্য্য একেবারে শেষ অবধি অগ্রসর হয় না—কারণ পাকস্থলীর হজমী রসের তত তেজ নাই। আধা-আধি হজম হইলে সেই অর্দ্ধ জীর্ণ খাদ্য অল্প অল্প করিয়া পাকযন্ত্রের পরবর্ত্তী অংশ অন্ত্রে (Intestine) আসিয়া পেঁৗছে। অন্ত্রকে আমরা চলিত কথায় নাড়ীভুঁড়ী বলি। তোমরা সবাই জান নাড়ীভুঁড়ী কত লম্বা। মানুষের নাড়ীভুঁড়ী প্রায় ২৭ ফুট লম্বা। এত লম্বা নাড়ীভুঁড়ীর প্রয়োজনীয়তা কি তাহা পরে বলিব। এই অন্ত্রের প্রথম অংশে পরিপাক ক্রিয়া খুব জোর দিয়াই সম্পন্ন হয়। নানা রকম তীব্র হজমী রস এইখানে আসিয়া অর্দ্ধ জীর্ণ খাদ্যের সহিত মিশে। এক দফা হজমী রস আসে, এই অন্ত্রেরই গা হইতে;—আর এক দফা আসে (Pancreas) প্যান্‌ক্রিয়াস নামক একটি হজমী রসের কারখানা হইতে; —আর এক দফা আসে লিভার বা যকৃৎ হইতে। লিভার

পাকস্থলী

হইতে যে রস আসে তাহাই হইল পিত্ত (biles)। এই লিভারের কথা তোমরা পরে আরও শুনিবে। প্যান্‌ক্রিয়াস হইতে যে হজমী রস আসে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র। এই সকল তীব্র হজমী রস অল্প সময়ের মধ্যেই অর্দ্ধ-জীর্ণ খাদ্যকে সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ করিয়া ফেলে। কিন্তু এত করিয়াও আমরা যাহা খাই, তাহার সব জিনিষ হজম হয় না—সেগুলি পরে মলের সহিত বাহির হইয়া যায়। কিন্তু খাদ্যের যে অংশ হজম হইল, সেগুলির দশা কি হয়? সেগুলি তখন অন্ত্রের গায়ে যে সকল কৈশিক রক্তনালী থাকে, তাহার মধ্য দিয়া রক্তস্রোতে প্রবেশ করে। জীর্ণ খাদ্যের এই ভাবে কৈশিক রক্তনালীতে প্রবেশ বড় শীঘ্র সমাধা হয় না—ইহাতে বেশ একটু সময় লাগে। ততক্ষণে জীর্ণ খাদ্যও যাহাতে আবার মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতে না পারে তাহার একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। ঠিক এই কারণেই ভগবান অন্ত্রটিকে অত লম্বা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে, এত লম্বা অন্ত্রের মধ্য দিয়া যাইতে যত সময় লাগিবে তাহার মধ্যে জীর্ণ খাদ্যের সবটুকুই কৈশিক রক্তনালীতে প্রবেশ করিবার সময় পাইবে। অন্ত্রের শেষ ৪ফুট অংশ অপেক্ষাকৃত মোটা—সেই জন্য এই অংশটীকে বৃহদন্ত্র বলে। এই বৃহদন্ত্র মল-

নালীতে (rectum & anus) আসিয়া শেষ হইয়াছে। এই মল-নালী যেখানে বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার নাম মলদ্বার। খাদ্যের অজীর্ণ অংশ এই বৃহদন্ত্রে আসিয়া জমে। এই বৃহদন্ত্রে অনেক জীবাণুদের আড্ডা।—সেই সকল জীবাণু এই অজীর্ণ খাদ্যের কনকাংশ জীর্ণ করে,—এবং তাহা যাইয়া রক্তের সঙ্গে মেশে,—কিন্তু অধিকাংশ ভাগই মলে পরিণত লইয়া মলনালীতে আসিয়া জমে। এইখান হইতে সুবিধামত মলদ্বার দিয়া এই মল নিষ্কাশিত করা হয়।

লিভারের কথা আগে একবার উল্লেখ করিয়াছি। এই লিভার হইল মানদের সর্ব্বপ্রধান ফ্যাক্টরী বা কারখানা। শরীরের প্রয়োজনীয়তা কত ভাঙ্গা গড়ার কার্য্য যে এখানে হইতেছে, তাহা হিসাব করা দায়। জীর্ণ খাদ্য যে অন্ত্রের কৈশিক রক্তনালী দিয়া রক্তস্রোতে আসিয়া পড়ে, তাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি. কিন্তু তখনই উহা সারা শরীরে সঞ্চালিত হইতে পায় না। অন্য কোথাও যাইবার আগে সেগুলিকে একবাব লিভারের ঢুকিতে হয়। মানবের আত্মরক্ষার পক্ষে এ ব্যবস্থা যে কতটা উপযোগী তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা যাহা কিছু খাই, তাহার মধ্যে বিষ

লিভার

থাকিতে পারে আরও কত কি থাকিতে পারে। মুখে দিলে তো তাহা অবশেষে জীর্ণ হইয়া রক্তে ঢুকিবে—কিন্তু তাই বলিয়া তাহা যদি শরীরের সর্ব্বত্রই বিনা বাধায় ঢুকিতে পায়, তবে তো মানুষের বাঁচাই দায় হইবে। শুধু তাই নয়;—হুড় হুড় করিয়া সমস্ত জীর্ণ খাদ্য ত অন্ত্রের রক্তনালীতে প্রবেশ করিল, —কিন্তু সে সমস্তই তো আর তখনই শরীরের প্রয়োজনের জন্য আবশ্যক নয়। তাহার অধিকাংশই ভবিষ্যতে ক্রমে ক্রমে দরকারে লাগিবে;—তবে অনর্থক সমস্ত জীর্ণ খাদ্যের বোঝা রক্তের ঘাড়ে চাপাইয়া রক্তকে ভারগ্রস্ত করিয়া লাভ কি? জীর্ণ খাদ্যের মধ্যে আবার এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা সেই অবস্থায় শরীরের কোনই কাজে লাগে না,—অথচ তাহাই একটু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ওলট্ পালট্ করিয়া কতকগুলি নূতন জিনিষ গড়িয়া লইলে তাহা শরীরের কাজে লাগিতে পারে। এই সব কারণের জন্য, যাহাই কেন অন্ত্রের মধ্য দিয়া রক্তস্রোতে প্রবেশ করুক না, তাহাকেই অবিলম্বে লিভারের মধ্যে আটকান হয়। লিভারের প্রকাণ্ড কারখানায় পড়িয়া, তাহাদের মধ্যের বিষের অংশ ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়, অথবা শরীরের পক্ষে নির্দ্দোষ কোনও বস্তুতে পরিণত হয়। যে

সব বস্তু শরীরের কোনও কাজে লাগে না, যত দূর সম্ভব, লিভার সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহা হইতে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় নূতন জিনিষ গড়িয়া দেয়। আর যে সকল জিনিষ শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিন্তু তখনই অনাবশ্যক, সেগুলিকে লিভার জমা করিয়া রাখে এবং প্রয়োজন মত সরবরাহ করে। ইহা ছাড়া লিভার হইতে নিঃসৃত রস (পিত্ত) হজমেরও সাহায্য করে। অতএব বুঝিতেছ, শরীরের পক্ষে, স্বাস্থ্যের পক্ষে লিভার কিরূপ প্রয়োজনীয়।

রক্তে কি প্রকারে খাদ্যাংশ এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভার আবশ্যক মত পৌঁছে তাহা তোমাদিগকে বলিলাম ;—কিন্তু শরীরের আবর্জ্জনা কি প্রকারে নিষ্কাষণ করা হয়, তাহা বিশদভাবে বলা হয় নাই। ফুসফুসের কথা প্রসঙ্গে তোমাদের আমি বলিয়াছি, কি প্রকারে শরীরের একটী প্রধান আবর্জ্জনা—কার্ব্বণ ডাইওক্সাইড গ্যাস—শরীর হইতে বাহির করা হয়। কিন্তু কার্ব্বণ ডাইওক্সাইডই তো শরীরের একমাত্র আবর্জ্জনা নয়। শরীরের একদফা আবর্জ্জনার জন্ম শরীরের ক্ষয়ের দরুণ;—আর একদফা আবর্জ্জনা হইতেছে, লিভারের কারখানায় শরীরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় যে

আবর্জ্জনা নিষ্কাষণ

সকল বস্তু পড়িয়া থাকে সেইগুলি। এই দুই দফা আবর্জ্জনাই শেষে রক্তের সহিত আসিয়া মিশে। এই আবর্জ্জনা নিষ্কাষণের জন্য শরীরের মধ্যে দুই সেট কারখানা আছে—এক সেটের নাম কিড্‌নি বা মূত্রযন্ত্র ;—আর এক সেটকে ঘর্ম্মযন্ত্র (Sweat glands) বলা চলে।

কিড্‌নি

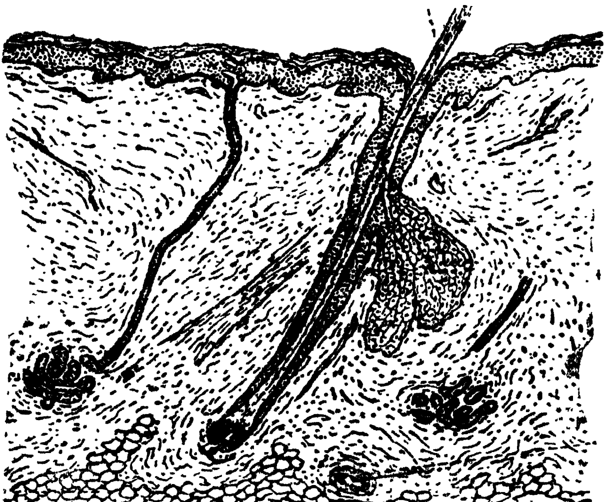
কিড্‌নির মধ্য দিয়া যখন রক্ত চলে, তখন কিড্‌নি নানা উপায়ে সেই রক্ত হইতে আবর্জ্জনাগুলি আলাদা করিয়া লইয়া মূত্রের সৃষ্টি করে। মানব-দেহে ঐরূপ একজোড়া কিড্‌নি আছে। এই একজোড়া কিড্‌নি দ্বারা সৃষ্ট মূত্র, একজোড়া নল বাহিয়া মূত্রাশয়ে (Bladder) আসিয়া জমা হয়। মূত্রাশয় প্রধানতঃ মাংসপেশী দ্বারা গঠিত একটী ব্যাগ বিশেষ। এই মূত্রাশয় হইতে একটী মূত্রনালী (urethra) বাহির পর্য্যন্ত গিয়াছে। যখন মূত্রাশয় সঙ্কুচিত হয়, তখন মূত্রনালী দিয়া মূত্র নিষ্কাষিত হয়।

ঘর্ম্ম যন্ত্র

ঘর্ম্মযন্ত্র মানব শরীরে একরূপ অসংখ্য বলিলেই চলে। শরীরের চামড়ার ঠিক নিচেই, প্রত্যেক স্থানেই ইহা বর্ত্তমান। কিড্‌নির ন্যায় ইহাও রক্ত হইতে অনেক আবর্জ্জনা আলাদা করিয়া লইয়া ঘর্ম্মের আকারে বাহির করিয়া দেয়।

মানবদেহের অত্যাবশ্যক সকল যন্ত্রের কথাই কিছু কিছু বলিলাম। শুধু প্লীহা সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই।

ক



গায়ের চামড়া—অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যেমন দেখা যায়!
ক—একগাছি চুল।
চুলের গোড়ার কাছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (আংটীর মত) ঘর্ম্মযন্ত্র দেখা যাইতেছে।

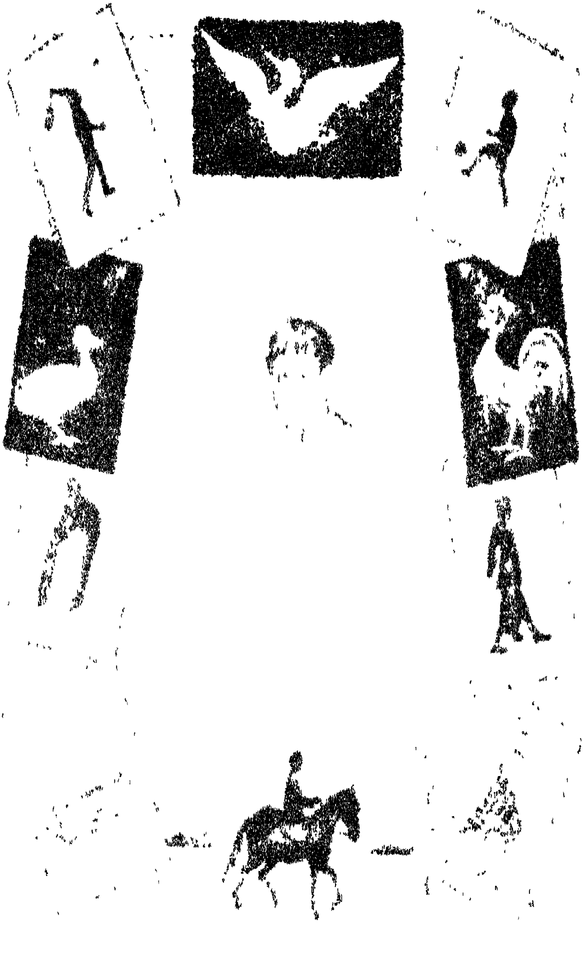
প্লীহার উপকারিতাও বড় বেশী নয়;—অন্ততঃ মানুষ এখনও ইহার খুব বেশী প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কার করিতে পারে নাই। তবে

প্লীহা

রক্তের লোহিত কণিকাগুলির ধ্বংশের সহিত প্লীহার সম্পর্ক আছে।

চর্ম্ম

এইরূপে মানবের যে অভিনব দেহযন্ত্রটী নির্ম্মিত হইয়াছে—তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে চর্ম্ম। এই আচ্ছাদনীর উপকারও বড় কম নয়। ইহা একদিকে যেমন, অভ্যন্তরস্থ নরম বস্তু সকলকে আচ্ছাদিত করিয়া রক্ষা করিতেছে;—অন্যদিকে তেমনি শীতের সময় সঙ্কুচন দ্বারা এবং গ্রীষ্মের সময় প্রসারণ দ্বারা সা । বৎসর ধরিয়া শরীরের উত্তাপ রক্ষা করিতে সাহায্য করিতেছে। তোমরা জান আমাদের শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮ ডিগ্রী (ফ্যারেনহিট্)। এই উত্তাপের বেশী কম হইলে শরীর যন্ত্র একটু একটু করিয়া নষ্ট হইয়া যায়,—তাই সারা বৎসর ধরিয়া শরীরের উত্তাপ রক্ষা একেবারে একান্ত আবশ্যক। চর্ম্মের সঙ্কোচ ও প্রসারণ এবং বিশেষভাবে ঘর্ম্ম ত্যাগ এই উত্তাপ রক্ষার প্রধান উপায়।



ব্যায়াম।

—:*:—

সে এক রাজা—মস্ত বড় তাঁহার রাজত্ব, বিস্তর তাঁহার ধন দৌলত, মণি মাণিক্য। রাজার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া। প্রজা মন্ত্রী আমলা—সব সময়েই রাজার সভা গম্‌গম্‌ করিত।

রাজার ভারী অসুখ। দেশশুদ্ধ হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। ডাক্তার আসিল; কবিরাজ আসিল; হাকিম আসিল। কিন্তু অসুখ আর সারে না। হাঁড়ি হাঁড়ি কাঁড়ি কাঁড়ি ঔষধ রাজা নিত্যই খান, কিন্তু হায় হায় রাজার অসুখও সারে না, রাজার দুঃখও ঘোচে না। শেষে ডাক্তার সাহেব আসিলেন—খাস বিলাতী ডাক্তার—তিনি আসিয়া সব দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন,

"রাজা বাহাদুর, এক কাজ করুন, প্রত্যহ সকালে রোদ না উঠিতে বিকালে রোদ একটু পড়িতে ডন করুন কুস্তি করুন, না হয় ফুটবল, টেনিস খেলুন, আর কিছুই না পারেন অন্ততঃ খুব জোরে প্রত্যহ দুবেলা খানিকটা করিয়া হাটুন।"

সর্ব্বনাশ! রাজাবাহাদুর—এত বড় রাজ্যের মালিক—তিনি কি না রামা শ্যামার মত খেলিবেন, হাঁটিবেন। রাজা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অমনি পাত্র, মিত্র, সভাসদ্‌গণ সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"ডাক্তার সাহেব বলে কি?—নিশ্চয়ই পাগল।"

রাজার পেট আবার কন্ কন্ করে, মাথা ঝন্ ঝন্ করে, বুক ধড়্ ফড়্ করে। এখন উপায়?

পাত্র মিত্র, সবাই আসিল, সবাই বলিল, "তাইতো এখন উপায়?"

রাজার পেট আবার কন্ কন্ করিয়া উঠিল, তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বলিলেন,—

"অর্দ্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যা—যে আমার অসুখ সারিয়া দিবে"

তখনই ঢাক ঢোল পিটাইয়া রাজার লোকজন দেশ বিদেশে ছুটিল এই সংবাদ রটাইতে।

এত বড় রাজার অর্দ্ধেক রাজত্ব, আর অমন সুন্দরী রাজ কন্যা—আর কি লোক স্থির থাকিতে পারে, দেশ বিদেশের হাকিম, কবিরাজ, ডাক্তারে রাজ্য ভরিয়া গেল।

আবার রাজা হাঁড়ি হাঁড়ি ঔষধ, কাঁড়ি কাঁড়ি পথ্য গেলেন, আর ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়েন।

তবু অসুখ ত সারে না।

রাজা কাঁদেন, রাণী কাঁদেন, রাজ্যের সব লোক কাঁদে—অসুখ আর সারে না।

শেষে আসিলেন জ্যোৎস্নাকুমার—জ্যোৎস্নার মত ফুট ফুটে দিব্য কান্তি, বলিষ্ঠ দেহ—রূপ ও স্বাস্থ্য যেন সর্ব্বাঙ্গে উথলিয়া পড়িতেছে।

সভাশুদ্ধ লোক সে রূপ দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

জ্যোৎস্নাকুমার রাজাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আমি রাজার অসুখ সারাইব।"

সভাশুদ্ধ লোক সে কথা শুনিয়া অবাক হইল।

"তাইত—এ বলে কি ?

রাজা বলিলেন—"ক্ষতি কি—দেখি না।"

সভাসদেরাও বলিল,—"তাইত ক্ষতি কি ?"

জ্যোৎস্নাকুমার তখন সভাসদগণের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন, বলিলেন,

"মহারাজ, আমি ভোজবাজি জানি, আমাকে যেমন তেমন যাদুকর ভাবিবেন না—পারস্য, আফগানিস্থান তুরস্কের যাদুকরেরা পর্য্যন্ত আমার নিকট পরাজয় স্বীকার

করিয়াছে। আমি যে যাদুবিদ্যা শিখিয়াছি তাহার দ্বারা পৃথিবীতে এমন কোন ব্যাধি নাই যাহা আমি আরোগ্য না করিতে পারি। মহারাজ, আমার ক্ষমতাটা একবার দেখুন।"

এই বলিয়া তাহার এক সঙ্গীর নিকট হইতে এক অদ্ভুত গদা লইয়া রাজার নিকট রাখিলেন। বলিলেন,

"মহারাজ, ইহাকে সামান্য গদা ভাবিবেন না। এই যে কাষ্ঠ দেখিতেছেন ইহা মিশর দেশের মন্ত্রপূতঃ কাষ্ঠ। যাদুবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মূর্ত্তি এই গদার উপর অঙ্কিত—আর আমি স্বয়ং ইহাকে মন্ত্রঃপূত করিয়াছি। এই গদা দ্বারাই মহারাজ আমি আপনার ব্যাধি আরোগ্য করিব। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় আপনি ও আমি এই গদা লইয়া আরোগ্যের জন্য যে সকল প্রক্রিয়া করা দরকার—করিব।"

পরদিন প্রাতে জ্যোৎস্নাকুমার রাজার বাগানের এক খোলা যায়গায় রাজাকে লইয়া গিয়া বলিলেন,

"মহারাজ, দেশ বিদেশ হইতে গাছ, গাছড়া, ওষধি সংগ্রহ করিয়া গদার মধ্যে রাখিয়াছি। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় যতক্ষণ না আপনার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাকে এই গদা ঘুরাইতে হইবে। দেহ ঘর্ম্মাক্ত

হইলেই গদার ভিতর যে মন্ত্রপূত ওষধি আছে তাহা কাজ করিতে আরম্ভ করিবে।"

মহারাজ প্রতিদিনই দুইবার করিয়া সেই মন্ত্রপূত গদা লইয়া খেলেন। প্রথম কয় দিনেই মহারাজের পেট কন্ কন্, বুক ধড়ফড় করা বন্ধ হইল। তাহার পরই মহারাজের আর মাথা দপ্ দপ্ করা বন্ধ হইল। এক সপ্তাহ, দু সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ, এক মাস গেল—মহারাজের দিব্য শরীর হইল—মহারাজ আরোগ্য লাভ করিলেন।

আবার রাজার মুখে হাসি ফুটিল, রাণীর মুখে হাসি ফুটিল, রাজ্যের লোক আমোদ আহ্লাদে মত্ত হইল।

জ্যোৎস্নাকুমার রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, রাজত্বের অর্দ্ধেক পাইয়াছেন।

সেদিন মস্ত বড় সভা বসিয়াছে। মহারাজ ও জ্যোৎস্নাকুমার দুই সিংহাসনে বসিয়াছেন।

সভাশুদ্ধ লোক জ্যোস্নাকুমারকে দেখিয়া ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল—এত বড় যাদুকর, এমন ক্ষমতা তাঁহার—ভূভারতে এমনটি আর কেহ কখন দেখে নাই। এই সময়ে জ্যোৎস্নাকুমার সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিলেন। বলিলেন,

"মহারাজ, সভাসদগণ, আপনারা হয় ত আমার ক্ষমতা ও এই মন্ত্রঃপূত গদার শক্তি দেখিয়া খুবই বিস্মিত

হইয়াছেন। আমি নগণ্য, আর আমার এই গদা ততোধিক নগণ্য। কিন্তু এই শক্তি তবে কোথা হইতে আসিল ?"...

রাজা ও সভাসদগণ সকলেই বলিয়া উঠিলেন,

"এ শক্তি তবে কোথা হইতে আসিল ?"

জ্যোৎস্নাকুমার বলিলেন,

হ্যাঁ মহারাজ, সেই উত্তর দিবার জন্যই আমি আজ আপনার নিকট আসিয়াছি। এই গদা নগণ্যও বটে, অমূল্য সম্পত্তিও বটে। সোনা রূপার দ্বারা এই গদার মূল্য নিরূপণ করা যায় না, কারণ আপনারা ত সকলেই দেখিলেন কিরূপে এই গদার মন্ত্র প্রভাবে রাজ্যেশ্বর রাজার অমূল্য প্রাণ রক্ষা পাইল, অথচ মহারাজ, ইহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর, কারণ আপনার রাজ্যের ক্ষুদ্রতম প্রজাও এই মন্ত্রযুক্ত গদা বিনা আয়াসে সংগ্রহ করিতে পারে।"

রাজা ও সভাসদগণ সকলেই বিস্ময়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন।

জ্যোৎস্নাকুমার আবার বলিলেন—

"হ্যাঁ মহারাজ, সত্যই তাই। এই গদা সাধারণ কাষ্ঠে নির্ম্মিত—এই কাষ্ঠের গদাই আপনার রোগ আরোগ্য করিয়াছে।"

"কিন্তু ইহার নিহিত মন্ত্র ?"

"সে মন্ত্র হইল—এই সামান্য কাষ্ঠে নির্ম্মিত গদায় আপনাদের অগাধ বিশ্বাস—যে, এই কাষ্ঠ নির্ম্মিত গদা অসাধারণ ঐশ্বরিক শক্তি-সম্পন্ন, যে এই গদার প্রভাবেই মানুষের সকল রকম রোগ আরাম হয়।"

তাহার পর রাজার দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"মহারাজ, আপনারা সহজ কথা বিশ্বাস করেন না বলিয়াই এই গদার শক্তি প্রতিপন্ন করিতে মিথ্যা কথা বলিতে হইয়াছে। তাহার জন্য আমায় ক্ষমা করুন। কিন্তু মহারাজ আমার কথায় বিশ্বাস করুন, সামান্য কাষ্ঠ নির্ম্মিত গদাই আপনার রোগ মুক্তির কারণ, আর এই গদায় আপনার বিশ্বাসই এত সহজে ও অল্প সময়ে আপনাকে রোগমুক্ত করিয়াছে।"

তাহার পর সভাসদগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

"মহাশয় সকল সময়েই আপনারা যে কোন উপায়ে পারেন শরীর চালনা করিবেন, আর এই বিশ্বাস রাখিবেন যে এইরূপ ব্যায়ামই শরীর সুস্থ ও সবল রাখিবার একমাত্র অমোঘ ঔষধ। এই বিশ্বাস রাখিয়া ব্যায়াম করিলে, দেখিবেন শরীর আপনার নীরোগ থাকিবে।"

শরীরকে সুস্থ ও সবল করিতে হইলে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গকে প্রত্যহ চালনা করা দরকার। যে

অঙ্গকে বেশী চালনা করা হইবে, সেই অঙ্গই অধিক বলশালা হইবে, যে অঙ্গকে কম চালনা করা হইবে সে অঙ্গ তেমনি দুর্ব্বল হইবে। ইহাই হইল প্রকৃতির নিয়ম।

যে কোন জিনিষ ব্যবহার না করিলে তাহাতে মরিচা পড়িয়া যায়। শেষে তাহা ব্যবহারের আর উপযোগী থাকে না। আমাদের শরীরের যে অঙ্গ আমরা ব্যবহার করি না, সে অঙ্গও ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শেষে কার্য্যের অনুপযোগী হয়।

যাহারা হাতুড়ী পিটিয়া থাকে—তাহাদের হাত দেখ কত শক্ত—তাহারা হাতের ব্যবহারই বেশী করিয়া থাকে। আমাদের হাত তেমন শক্ত হয় না। কারণ আমরা উহার সেরূপ ব্যবহার করি না। আমাদের শরীরের প্রত্যেক অঙ্গই হাতুড়ের হাতের মত শক্ত ও বলশালী হইতে পারে, যদি আমরা আমাদের অঙ্গগুলির তেমন ব্যবহার করিতে পারি।

তোমরা সেই প্রসিদ্ধ বলবান জোয়ান স্যাণ্ডোর নাম নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। স্যাণ্ডোর প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লোহার ন্যায় শক্ত, তিনি দেশবিদেশে তাঁহার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বাল্যকালে তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল

ছিলেন, তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবেরা তখন তাঁহার জীবনের আশা করেন নাই। কিন্তু তিনি নিজে ডাক্তার ছিলেন, তিনি জানিতেন শরীরকে সবল ও সুস্থ করিবার চাবি কাঠি লোকের নিজের হাতেই আছে। তিনি শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়মিত ভাবে চালনা করিতে লগিলেন, এবং ফলে তাঁহার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গই সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল। শরীর চালনার দিকে তিনি এরূপ মন দিয়াছিলেন যে এক কালে তাঁহার মত বলিষ্ঠ ও সবল লোক আর ছিল না। শুধু শরীর চালনা করিয়া তিনি এরূপ অদ্ভুত ফল পাইয়াছেন বলিয়াই তিনি সকলকে ব্যায়াম করিতে বলিয়াছেন। মানুষকে সুস্থ ও সবল করিবার জন্য তিনি এক নূতন ধরণের ব্যায়াম পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। গৃহের বাহির না হ য়া যাঁহারা শরীর চালনা করিতে চাহেন তাহাদের পক্ষে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্যায়াম পদ্ধতি অত্যুৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। তোমাদের মধ্যে যাহাদের খোলা মাঠে যাইয়া খেলিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে না, তাহারা স্যাণ্ডোর গ্রিপ ডাম্বেল, কিম্বা ডেভলপার লইয়া প্রত্যহ কিছুক্ষণ খেলিতে পার। স্যাণ্ডো বলেন, তাঁহার প্রবর্ত্তিত গ্রিপ ডাম্বেল কিম্বা ডেভলপার লইয়া প্রত্যহ শরীর পরিচালনা করিলে যে

কোন মানুষ নীরোগ ও সুস্থ হইতে পারে। মানুষের পক্ষে ইহা বড় কম সৌভাগ্য নয়।

খোলা যায়গায় আলো ও বাতাসের মধ্যে ব্যায়াম করা ভাল। যে সকল বালক খোলা যায়গায় খেলে কিম্বা কাজ করে তাহাদের দেহ সুস্থ ও সবল হয়। কিন্তু যাহারা ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকে তাহারা ক্রমশঃই দুর্ব্বল হয় ও শেষে তাহাদের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

যাহাদের সুযোগ হইবে তাহারা খোলা মাঠে ফুটবল টেনিস প্রভৃতি খেলিতে পার। যাহাদের তেমন সুযোগ হইবে না তাহারা প্রত্যহ স্যাণ্ডোর গ্রিপ ডাম্বেল কিম্বা ডেভলপার দ্বারা শরীর চালনা করিবে। কিন্তু ঐ সব ব্যায়াম করার সুযোগও যাহাদের হইবে না তাহারা প্রত্যহ খুব জোরে খানিকটা করিয়া হাঁটিয়া বেড়াইবে। পুষ্করিণীতে সাঁতার কাটা একটী সহজ, সুখকর ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ব্যায়াম। এরূপ ব্যায়াম করা যেরূপ সহজ তেমনি উপকারী।

কিন্তু সাবধান, শরীরে যেরূপ সহে সেইরূপ ব্যায়াম করাই ভাল। শরীরে যেরূপ সহে তাহার অতিরিক্ত ব্যায়াম করিলে উপকার অপেক্ষা অনুপকারই বেশী হয়।

আমরা যেন শুধু এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখি, শরীরকে সবল ও সুস্থ রাখিতে মুক্ত বায়ুতে নিয়মিত শরীর চালনা করা দরকার। দেহের স্বাস্থ্যের উপর এই ব্যায়াম ভোজবাজীর ন্যায়ই কার্য্য করে। এবং এই ব্যায়াম ভিন্ন দেহকে সুস্থ করিবার আর অন্য কোন উপায় নাই।

এই কথাটি ভাল করে মনে রেখ ভাই।
সকাল সাঁঝে একটু খানি ব্যায়াম করা চাই॥
ফাঁকা মাঠে ফাঁকা হাওয়ায় সহ্য যেমন হবে।
স্ফূর্ত্তি করে কোমর বেঁধে কর্ব্বে ব্যায়াম সবে।
আসবে খানিক কোসে হেটে যেমন হবে ভোর॥
দেখবে কেমন থাকবে শরীর নিত্য পাবে জোর।
অসুখ ব্যাধি পালায় ছুটে মুখটি করে চুণ।
ব্যায়াম হলো এমনি জিনিষ এমনি তার গুণ॥

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।

(১)

রাজ্যের ছেলেমেয়ে বুড়ো সকলেই আজ আনন্দে মাতিয়াছে—সকলের মুখেই হাসি যেন আর ধরে না। আজ রাজধানীর প্রত্যেক গৃহ প্রাচীর বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়াছে—সারা রাজ্যময় আজ যেন আনন্দের লহর খেলিয়া যাইতেছে।

আজ কিসের এত আনন্দ—কোলাহল?

যুবরাজ যুদ্ধে জিতিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতেছেন—তাই এত আনন্দ, তাই এত কোলাহল। তাই, ঐ দেখ তোরণ দ্বার অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হইয়াছে, তাই ঐ দেখ প্রত্যেক গৃহ চূড়ায় বিজয়পতাকা উড়িতেছে।

যুবরাজ সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করিয়া দেশের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছেন, দেশের লোক তাই বিজয়ী বীরকে উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিবেন। ঐ দেখ স্বয়ং রাজ্যেশ্বর রাজা রাজপরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া যুবরাজের সম্বর্দ্ধনায় আসিয়াছেন। চারণ বালকগণ জয়-গান করিতে করিতে

ঐ দেখ যুবরাজের অভ্যর্থনা করিতেছেন। ঐ শুন, পুরমহিলাগণ অন্তঃপুর হইতে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি করিতেছেন।

রাজধানীর প্রবেশ পথে অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত তোরণদ্বার প্রস্তুত হইয়াছে, যুবরাজ সেখানে আসিয়া রথ হইতে নামিলেন, রাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, তাহার পর সমবেত প্রজাপুঞ্জকে সহাস্য বদনে অভিবাদন করিলেন।

যুবরাজ যেদিকে চাহেন সেইদিকেই দেখেন নানা বর্ণের বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া সারা রাজ্য যেন আজ আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে, যেদিকে চাহেন সেইদিকেই দেখেন, চিত্তচমকপ্রদ অপূর্ব্ব দৃশ্য। কিন্তু সম্মুখে যে সুন্দর ও অপার্থিব দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তিনি একেবার চমকিয়া উঠিলেন।

এ যে সোণার বালক?

তবে কি এ সোণার প্রতিমা?—না, তাওত নয়, ঐ দেখ বালক হাত তুলিয়া যুবরাজকে অভিবাদন করিতেছে; যুবরাজ সানন্দে যাইয়া বালকের হাত ধরিলেন। কিন্তু

বালকের মুখে আর সে হাসি নাই, চোখে আর সে তড়িৎ চাহনি নাই—বালক নীরব নিস্পন্দ। এ কি! এ কি! যুবরাজকে অভিবাদন করিয়াই সেই প্রফুল্ল বদন সোণার বালক যুবরাজের হাতে ঢলিয়া পড়িল!

মুহূর্ত্তের মধ্যে এ ঘটনা ঘটিয়া গেল, মুহূর্ত্তের মধ্যে সে আনন্দ কোলাহল নিরানন্দে পরিণত হইল। সেদিনকার আমোদ আর তেমন জমিল না।

সোণার বালক?—যুবরাজের অভ্যর্থনার জন্য বালকের সারা অঙ্গ সোণালি রঙে চিত্রিত হইয়াছিল। বালক অসুস্থ হইতেই তাহার অঙ্গ হইতে সে সোণালী রঙ ধুইয়া ফেলা হইল। কিন্তু হায়, বালক আর উঠিল না, ধুইয়া ফেলিবার পূর্ব্বেই বালকের শেষ নিশ্বাস বহিয়া গিয়াছে।

কেন এমন হইল?

তোমার আমার সকলের শরীরের মধ্যে কত কি পদার্থ আছে, কিন্তু সে সব ঢাকিয়া রাখিয়াছে আমাদের শরীরের উপরের খোলস চামড়া। তোমার শরীরের এক খণ্ড চামড়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখিলে দেখিতে পাইবে তাহার মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট ছিদ্র আছে। চামড়ার মধ্য দিয়া এক প্রকার ছোট ছোট নল

বাহির হইয়া আসিয়াছে—ঐ ছোট ছোট ছিদ্রগুলিই সেই নলের মুখ।

বাড়ীর মধ্যে যেমন জানালা থাকে, আমাদের শরীরের মধ্যেও তেমনি ঐরূপ ছোট ছোট ছিদ্র আছে। বৃষ্টি রৌদ্র প্রভৃতি নানারকম উৎপাত হইতে বাঁচিবার জন্য আমরা বাড়ী ঘর প্রস্তুত করি। কিন্তু আলো বাতাস যাইবার জন্য বিশেষতঃ ঘরের ভিতরকার দূষিত বায়ু বাহির করিবার জন্য বাড়ীর দেওয়ালের মধ্যে আবার ছোট ছোট জানালা ফুটাই। আমাদের শরীরের ভিতরের মাংস প্রভৃতিকে নানারকম উৎপাত হইতে বাঁচাইবার জন্য আমাদেরও চামড়া আছে, আর এই চামড়া ঘেরা শরীরের জানালার কার্য্য করে ঐ ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলি। জানালা খুলিলে ঘরের দূষিত বায়ু সব বাহির হইয়া যায়, এবং সেই স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু আসিয়া ঢোকে। আমাদের শরীরের ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলিও ঠিক ঐরূপ জানালার কাজই করে। তাহারাও শরীরের ভিতরের দূষিত পদার্থ ও ময়লা রস বাহির করিয়া দেয়। তোমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাইবে শরীরের উপর অনেক ময়লা জমিয়াছে—কিম্বা হয় ত ঘামিতেছ। ঐ সকল ময়লা শরীরের ভিতর হইতে ঐ সকল ছোট ছোট ছিদ্র দিয়া আসে, সাধারণতঃ বাহির হইতে আসে না, আর

ঐ ঘর্ম্ম ও শরীরের ভিতরের ময়লা রস, উহাও ঐ ক্ষুদ্র ছিদ্র হইতে আসিয়াছে।

তোমরা বল দেখি, হঠাৎ যদি তোমার ঘরের সব জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তবে ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়ায়। তোমাদের একটু আগেই বলিয়াছি তাহা হইলে দূষিত বায়ু সেবন করিয়া নিশ্চয়ই তোমরা বেশীক্ষণ বাঁচিতে পার না। আমাদের শরীরের এই জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দিলে আমাদের অনেকটা ঐরূপ অবস্থাই হয়। আমাদের চামড়ার উপরের ঐ ছিদ্রগুলি বন্ধ হইয়া গেলে আমরা অচিরে অসুস্থ হইয়া জীবন হারাইব।

ঐ সোণার বালকটির শরীরের উপরের সব ছিদ্রগুলি সোণার রঙে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তখন তাহার শরীরের ভিতরে কি ভীষণ হুলস্থূল বাঁধিয়া গেল তাহা তোমরা সহজেই বুঝিতে পার। লোমকূপের মুখগুলি সব বন্ধ হওয়াতে অল্প সময়ের মধ্যেই বালক অসুস্থ হইল এবং অচিরে প্রাণ হারাইল।

আমাদের চামড়ার উপর শরীরের ভিতরকার ময়লা বাহির হইয়া অনবরত জমিতেছে। সে সব যদি আমরা প্রত্যহ পরিষ্কার না করি তবে কাজেই ঐ ময়লাতে ছিদ্র

গুলি বন্ধ হইয়া যাইবে, আর জানালার কাজ করিতে পারিবে না। ফলে ক্রমশঃ শরীর অসুস্থ হয়।

গরম পড়িলে আমরা ভয়ানক ঘামিয়া থাকি। কোন প্রকার শরীর চালনা করার পরও আমরা তেমনি ঘামিয়া থাকি। ঐ ঘামের সঙ্গে শরীরের ভিতরকার কতরকম ময়লা বাহির হইয়া আসে। খানিকক্ষণ পরে ঐ ঘাম শুকাইয়া যায় ও ময়লাগুলি চামড়ার উপরেই থাকিয়া যায়। আমরা যদি প্রত্যহ ভাল করিয়া সর্ব্বাঙ্গ না ধুইয়া ফেলি তবে ক্রমশঃ ঐ সকল ময়লা চামড়ার উপরকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলি বন্ধ করিয়া ফেলিবে।

আমাদের শরীরের উপরকার চামড়াগুলি যদি পরিষ্কার থাকে তবে ঐ ছিদ্রগুলি দিরারাত্র তাহাদের কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু ছিদ্রগুলি বন্ধ হইয়া গেলে তাহারা আর কোন কাজ করিতে পারে না। কাজেই আমাদের সুস্থ ও সবল হইতে হইলে প্রত্যহ শরীরের উপরের চামড়াকে পরিষ্কার রাখিতে হইবে।

শরীর যে না রাখতে জানে তাকেই ধরে রোগ,
খোস পাঁচড়া লেগেই থাকে দিনরাত্তির ভোগ।
দেহের প্রতি দৃষ্টিটুকু রাখ্‌বে সদা ভাই,
কেমন করে স্বাস্থ্য থাকে জেনে রাখা চাই।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক্‌বে তুমি যত,
স্বাস্থ্য তোমার থাক্‌বে ভাল দেখবে তুমি তত।
দাঁতটী মেজে মুখটী ধোবে প্রতি সকাল বেলা
তার পরেতে লেখা পড়া, তার পরেতে খেলা।



লক্ষ্মীশ্রী।

(২)

এক এক জনের বাড়ী দেখিতে পাই—যেন লক্ষ্মীশ্রী সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের স্নেহের বাড়ী ঠিক তেমনি। সর্ব্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট্ট বাড়ীটি, কিন্তু কোথাও ধূলা আবর্জ্জনা নাই, সুন্দর গোছান, যেখানে যেটি আবশ্যক সেখানে সেটিই আছে।

স্নেহ ভোরে কাক না ডাকিতে উঠিয়াই ঘর দরজা সব পরিষ্কার করে, যেখানে রাখিলে যে জিনিষটি মানায় সেখানে সেই জিনিষটি রাখিয়া দেয়। বাড়ীর সবাই উঠিয়া দেখে ঘর দরজা সব ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করিতেছে। বাড়ীর ঝি আসিলেই তাহার দ্বারা উঠান রান্নাঘর নিজে দাঁড়াইয়া মাজিয়া ধোয়াইয়া লয়—নিজে না দাঁড়াইলে যে তারা ফাঁকি দেয় সেই জন্যই নিজে দাঁড়ায়। তাহার পরই বিছানা বালিস প্রভৃতি নিজের হাতে রৌদ্রে দেয়, কেহ আপত্তি করিলে বলে, ঝি চাকর ওরা প্রত্যহ বিছানা রৌদ্রে দিতে চায় না, কিন্তু আমি ত আর মাহিনার চাকর নই। আমি না দিয়া কি

করিয়া থাকি ? সেই ছেলেবেলায় বইতে পড়িয়াছিলাম বিছানাদি রৌদ্রে না দিলে ঠাণ্ডা ঘরে থাকিয়া সে সবে নানা প্রকার রোগের জীবাণু জন্মে। বিছানা প্রত্যহ রৌদ্রে দিলে রোগের জীবাণু সূর্য্যের উত্তাপে ত মরেই, রাত্রে শুইবার পক্ষে উপরন্তু বেশ আরামদায়ক হয়। স্নেহের বিছানায় কোন দিন ছারপোকা দেখি নাই, ছারপোকার নাম উঠিলে সে বলে ছারপোকার ডিম ত সব রৌদ্রের উত্তাপে মরিয়া যায়, ছারপোকা আবার কোথা হইতে আসিবে।

স্নেহ সর্ব্বদা ফিট্ফাট্ পরিষ্কার থাকে। নিজেদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, নাই বা থাকিল, সে নিজে প্রত্যহ কাপড় কাচিয়া পরিষ্কার করে। কোথাও দুর্গন্ধ থাকিবার যোটি নাই, দুর্গন্ধের উদ্দেশ পাইলেই ঝাঁটা, ফেনাইল লইয়া যাইয়া সপাসপ ঝাটাইয়া প্রহার করিতে করিতে দুর্গন্ধকে সে বাড়ীছাড়া করে।

প্রত্যহ খাইবার আগে সে হাত ধুইয়া লয়, পাছে হাতের যত সব ময়লা পেটে যাইয়া পেটে গোলমাল বাধায়, নিজের ও ছেলেমেয়েদের নখ একটু বড় হলেই কাটিয়া দেয় পাছে নখের ভিতর ময়লা জমিয়া তাহা খাবারের সহিত পেটের মধ্যে ঢুকে।



স্নেহ উড়ে বামুনের হাতে জন্মে কাহাকেও খাইতে দেয় নাই। সে বলিত ওরা ভারি নোংরা। নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিপাটি ভাবে রান্নাবান্না করিত।

[স্বাস্থ্য চিত্রে ও গল্পে]

স্নেহর ছেলেমেয়েদের মাথায় একরাশ করিয়া চুল। স্নেহ বলে নিয়মিত ভাল তেল মাথায় মাখিয়া তাদের এই রকম চুল হইয়াছে। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে ও চুলের জন্য মাথায় তেল মাখা দরকার। বিজ্ঞাপনের চটকে ভুলিয়া স্নেহ কখনই বাজারে খেলো তেল মাখে না। ওগুলি যে সস্তা খনিজ তেলের সহিত উগ্র বিলাতি এসেন্স মিশাইয়া তৈরী হইয়াছে তাহা সে ভালরূপই জানিত। নারিকেল, রেড়ি কিম্বা তিলের তেলের সঙ্গে সামান্য একটু গন্ধ মিশাইয়া সে তেলকে সুগন্ধি করিত। এই সব উদ্ভিজ্জ তেল তাহারা নিত্য মাখিত বলিয়াই তাহাদের চুলের এত বাহার।

স্নেহের বাড়ীর ঘর দরজায় কোথাও এতটুকু ধূলা ছিল না। রাস্তায় ধূলা উড়িবার সময় সে ছেলেমেয়েদের বাহির হইতে দিত না। অন্যান্য বাড়ীর ছেলেমেয়েদের দেখা যায় ধূলা কাদা মাখিয়া সর্দ্দিতে ভস্ ভস্ করিতেছে কিন্তু স্নেহর ছেলেদের তেমন সর্দ্দি হয় না, কারণ স্নেহর ছেলেমেয়েদের ত আর ধূলায় পড়িয়া থাকিতে হয় না।

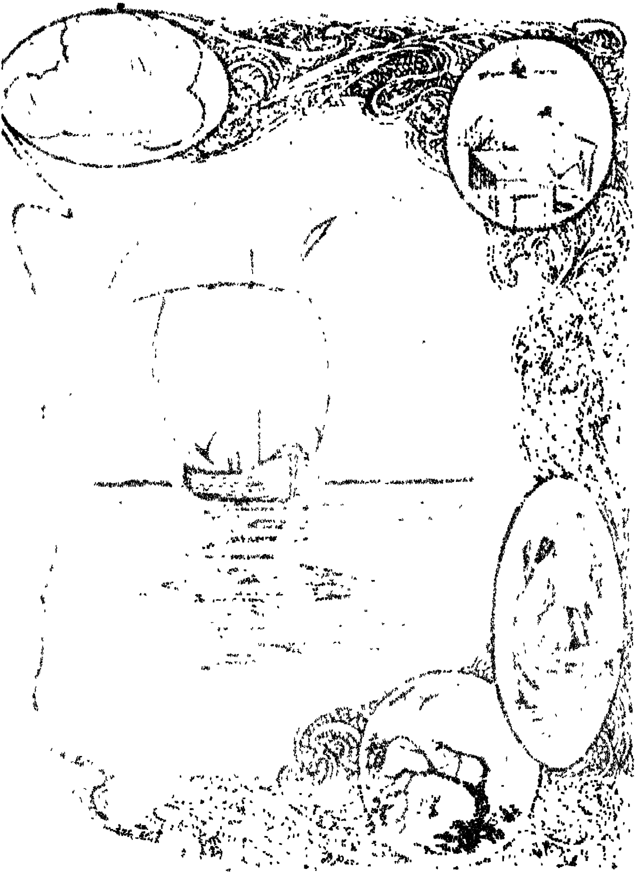
স্নেহর বাড়ীর ছেলেমেয়েরা রোজ স্নান করে, স্নান করিবার সময় সর্ব্বাঙ্গ বেশ ভাল করিয়া ধৌত করে। আহারের অনিয়মে পেটে ময়লা জমিলেই জোলাপ লইয়া

শেট পরিষ্কার করিয়া দেয়, সেইজন্য খোস পাঁচড়া যে কি পদার্থ তাহা বাড়ীর ছেলেমেয়েরা জানে না।

স্নেহ উড়ে বামুনের হাতে জন্মে কাহাকেও খাইতে দেয় নাই। সে বলিত ওরা ভারী নোওরা। নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিপাটি ভাবে রান্নাবান্না করিত।

এইরূপ পরিষ্কার থাকার জন্য উহাদের একটি পয়সাও অতিরিক্ত লাগে না, অভ্যাসমত সকাল হইতে সব কাজ করিয়া যায়, একটুও বেশী পরিশ্রম হয় বলিয়া মনে হয় না। আর এক অদ্ভুত ব্যাপার, ডাক্তার বৈদ্য তাহাদের বাড়ীতে বড় একটা আসে না কারণ অসুখ বিসুখ স্নেহর বাড়ীতে আদবেই ঘেষিতে পারে না।

তোমাদের কি সবাইর এইরূপ হইতে ইচ্ছা হয় না?



মুক্ত বায়ু।

(১)

এক দেশে এক রাজা ছিলেন—নাম তাঁর হাতীবাহন। রাজার রাজ্যটা ছিল যেমনি প্রকাণ্ড—রাজপুরীটাও ছিল তেমনি বিরাট—কত ঘর, কত দ্বার কিছু তার ঠিক ঠিকানা নাই। রাজার সুশাসনে রাজ্যে সুখ আর ধরে না। রাজার সবই আছে—কেবল নাই শুধু একটি ছেলে। সেই জন্য রাজা রাণীর প্রাণে মোটেই সুখ ছিল না। রাজা দুঃখ জানাইতেন রাণীর কাছে; আর রাণী দুঃখ জানাইতেন রাজার কাছে। এই ভাবে রাজার দিন যায়—রাজা রাণী রোজই ভাবেন এইবার তাঁহাদের একটি ছেলে হইবে, কিন্তু ছেলে আর হয় না! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর যায় তবুও রাণীর আর ছেলে হয় না। এদিকে রাজার বয়স দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে একদিন সকালে রাজা আয়না দিয়া মুখ দেখিতে গিয়া দেখেন তাঁহার কালো কালো বড় বড় দাড়ীগুলির ভিতর একটি দাড়ী সাদা হইয়া উঠিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ! দাড়ী পাকিয়াছে—

আর তো একদিনও সবুর করা যায় না। তখনই মন্ত্রীর ডাক পড়িল। মন্ত্রী আসিয়া হাজির। রাজা মহাশয় বলিলেন,—"মন্ত্রী—এখন উপায় কর, আমার কালো দাড়ী সাদা হইয়া উঠিয়াছে—আর ত আমি কিছুতেই সবুর করিতে পারি না। এখনই আমার একটী ছেলের ব্যবস্থা কর।"

রাজার এই অসম্ভব কথায় মন্ত্রী মহাশয়ও একেবারে চুপ, তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। রাজার হুকুম অমান্য করিলে একেবারে গর্দ্দানা যাইবে! উপায় একটা না করিলেই নয়। মন্ত্রী এ পুঁথি ঘাটেন ও পুঁথি ঘাটেন কিন্তু উপায় আর খুঁজিয়া পান না। শেষটা ভাবিতে ভাবিতে মন্ত্রির বুদ্ধিভ্রংশ হইবার উপক্রম হইল। উদোর বোঝা বুদোর ঘারে চাপাইয়া দিবার জন্য মন্ত্রী মহাশয় তখনই রাজ্যের ভাল ভাল বামুন পণ্ডিতদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। মন্ত্রী মহাশয়ের কথা শুনিয়া তাহারা টিকি নাড়িয়া পৈতা দেখাইয়া বলিলেন,—"এই কথা! মন্ত্রী মহাশয় এর জন্য আর চিন্তা কি! এর উপায় ত আমাদের কাছেই আছে।"

বামুন পণ্ডিতরা তখনই উপায় করিতে বসিয়া গেলেন। রাজবাড়ীর কাণ্ডই আলাদা। জালা জালা ঘি আসিল—

গোটা গোটা কাঠ আসিল—ঝুড়ি ঝুড়ি ফল আসিল—বস্তা বস্তা চাউল আসিল। আয়োজন যা হইল—তা একটা বিরাট বটে। সকলেই বলিল—হুঁ—এ একটা উপায়ের মত উপায় বটে। হোমের আগুণ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল. বড় বড় পণ্ডিত বড বড় মন্ত্র আওড়াইয়া আগুনে ঘি ঢালিতে লাগিলেন.। সে হোম আর বন্ধ হয় না; এক মাস গেল—দুই মাস গেল—বছরের পর বছরও চলিয়া যায়, কিন্তু রাজার ছেলে হইল না, রাণীর দুঃখও ঘুচিল না।

পণ্ডিতেরা হোম করেন, যজ্ঞ করেন—রাজার ঘরের খবর রাখেন না।

সেদিন সকালে পণ্ডিতেরা আসিয়া সবে হোমের আগুন জ্বালিতে যাইতেছিলেন—সেই সময় রাজার লোক আসিয়া সংবাদ দিল, ফুট ফুটে চেহারা. টুক টুকে রঙ, নধর চেহারা রাজার ছেলে হইয়াছে।

বড় বড় পণ্ডিত বড় বড় টিকি নাড়িয়া নৈবেদ্য সাজাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজার সম্মুখে বুক ফুলাইয়া বলিলেন, মহারাজ আমাদের এ হোম কি বিফল হয়!

রাজার আনন্দ দেখে কে? রাজা মুটো মুটো সোনার টাকা বামুন পণ্ডিতদের দান করিলেন। হাজার হাজার

কাঙ্গালী ভোজন হইল ; লক্ষ লক্ষ বামুন বিদায় পাইলেন ; হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ বিলি হইল। সে এক বিরাট কাণ্ড।

রাজার ছেলে—নাম তার নাড়ুগোপাল। দেখিতে ঠিক নাড়ুগোপাল—দিব্বি থলথলে চেহারা। দেখিতে দেখিতে নাড়ুগোপাল এক বছর, দুই বছর করিয়া তিন বছরের হইল। বুড়ো বয়সের রাজা রাণীর ছেলে। ছেলের যত্ন দেখে কে ? ছেলে দিন রাত দামী দামী পোষাক পরিয়া কেবল দাসী চাকরের কোলে কোলে ঘোরে। এক মিনিট ছেলে কোল হইতে নামে না। রাজা রাণী ছেলের জন্য সারা—এই বুঝি ছেলের অসুখ হইল—এই বুঝি ছেলের ঠাণ্ডা লাগিল। তাই পুতু পুতু করিয়া সর্ব্বদা ছেলেকে সাবধান রাখেন, কিন্তু রাখিলে কি হইবে—যত পুতু পুতু করে ছেলে তত গলিতে গলিতে সলিতা হইয়া যাইতে লাগিল। আজ সর্দ্দি, কাল জ্বর—একদিনের জন্যও নাড়ুগোপাল সুস্থ নাই। রাজার ছেলে নাড়ুগোপাল—সে ননি মাখন মিছরী খাইতেছে, তবু তাহার রোগ যায় না। রাজা মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মন্ত্রি একি ব্যাপার ! রামার ছেলে শ্যামার ছেলে মোটা, আর আমার ছেলে কিনা গল্‌তে গল্‌তে যায় ;—একি কাণ্ড !"

মন্ত্রী রাজার সম্মুখে আসিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—বলিলেন—তাইতো মহারাজ এ কি কাণ্ড! ঘোর কলি। ঘোর কলি!

কিন্তু কলির দোহাইতে রাজার মন সন্তুষ্ট হইল না।

রাজা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তোমার মত অকর্ম্মন্য মন্ত্রী আমি আর কোথাও দেখি নাই। আমি তোমার কোন কথা শুনিতে চাহি না। ডাক্তার ডাক বৈদ্য ডাক—হাকিম ডাক—যেমন করিয়া পার আমার ছেলেকে মোটা করিয়া দাও।"

রাজার হুকুম! তখনই ডাক্তার আসিল, বৈদ্য আসিল, হাকিম আসিল। শিশি শিশি—বোতল বোতল—জালা জালা ঔষধ ছেলের পেটে গেল। কিন্তু ছেলে মোটা হয় না, প্যান প্যানে, ঘ্যান ঘ্যানে রোগও আর সারে না। রাজার মনের সুখ গেল—রাণীর চোখে জল ঝরিল—পাত্র মিত্র সভাসদগণ হায় হায় করিতে লাগিল, কিন্তু রোগ যেমন ছিল তেমনিই রহিল।

রাজা ভাবেন, তাইত, রামা শ্যামার ছেলে মোটা হয়, আর আমার ছেলে মোটা হয় না, একি অদ্ভুত কথা, কেন এমন হয়?

রাজা মন্ত্রীকে হুকুম দিলেন, "রাজ্যে যত মোটা ছেলের

বাপ আছে তাদের সকলকে এখনি আমার সামনে হাজির কর।"

রাজার হুকুম পাইয়া মন্ত্রী কোটালকে হুকুম দিলেন, কোটাল লোকজন লইয়া রাজ্যের ছেলের বাপদের ধরিয়া আনিতে ছুটিল। যার ছেলে মোটা তার আর রক্ষা নাই। কোটাল তাদের ধরিয়া আনিয়া রাজার সম্মুখে আনিয়া হাজির করিল। মোটা ছেলের বাপেরা রাজার সম্মুখে কাঁপিতে কাঁপিত বলিল "মহারাজ আমাদের কোন দোষ নাই, কোটাল আমাদের শুধু শুধু বাঁধিয়া আনিয়াছে!"

রাজা ধমক দিয়া বলিলেন,—"তোদের ছেলে মোটা?"

সকলেই হাত জোড় করিয়া বলিল—"হাঁ মহারাজ, তবে তেমন মোটা নহে।"

রাজা বলিলেন,—"এখনি যত মোটা ছেলে আছে তাদের এনে হাজির কর।" আবার কোটাল ছুটিল। যেখানে যত মোটা ছেলে—তাদের আনিয়া হাজির করিল। তাদের সব চাইতে যে ছেলেটি মোটা—হৃষ্ট পুষ্ট, রাজা সেই ছেলেটিকে দেখাইয়া বলিলেন—"এই ছেলেটা কার?"

মোটা ছেলের বাপদের ভিতর একজন বলিল, "মহারাজ,—আমার।"

রাজা বলিলেন, "এ ছেলে খায় কি ?"

মোটা 'ছেলের বাপ বলিল, "মহারাজ—আমরা গরীব—আমরা আর ছেলেকে কি খাওয়াইব—ভাত আর ডাল খায়।"

ভাত আর ডাল খায়, নিশ্চয়ই সে চালের কোন গুণ আছে। ডাক সেই দোকানীকে যে এই মোটা ছেলের বাড়ীতে চাল দেয়। কোটাল আবার সেই দোকানীকে ধরিয়া আনিয়া হাজির করিল। রাজা বলিলেন—"তুই এই মোটা ছেলের বাপটাকে যে চাল দিস্ সেই চাল আমাকে দিবি।"

মোটা ছেলে যে চাল খায়—রাজার ছেলের সেই চাল খাইবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু তবুও রাজার ছেলে মোটা হইল না। রাজা রাণীর দুঃখও ঘুচিল না। তখন্ রাজা আর কি করেন! কেবল গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সেই সময় রাজসভায় এক সন্ন্যাসী আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি জানি কি করিলে আপনার ছেলে মোটা হয়।"

রাজা, পাত্র' মিত্র সভাসদ সকলেই বলিয়া উঠিল "কি ? কি ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "মহারাজ, ছেলে দিন রাত কোলে কোলে রাখিবেন না—ছেলেকে খেলা করিতে দিন; তাকে ইচ্ছামত বেড়াইতে, খেলিতে দিন, খোলা গায়ে খোলা হাওয়া লাগুক, যা পাবে তাই খাবে, দেখিবেন ছেলে আপনিই মোটা হইবে। শীত গ্রীষ্ম—রৌদ্র বৃষ্টি দেহে সহ্য করাইতে হইবে। যাহাদের ছেলে শীত গ্রীষ্ম, রৌদ্র বৃষ্টির ভিতর দিয়া বাড়ে তাহাদের ছেলেই হৃষ্ট পুষ্ট,—দেখিতে ভাল হয়। জল বৃষ্টি, রৌদ্র, হাওয়া, এ সব ঈশ্বরের দান—এ সব ছেলেদের গায়ে না লাগিলে ছেলে মানুষ হয় না।

রাজা সন্ন্যাসীর কথা মত ছেলেকে রৌদ্র বৃষ্টি শীত গ্রীষ্ম সহ্য করাইতে আরম্ভ করিলেন।

ছেলে বৃষ্টি দেখিলে আর পলায় না রৌদ্র দেখিলে আর ভয় পায় না, যেখানে খোলা হাওয়া দেখে সেইখানেই ছুটিয়া যায়। হাঁড়ি হাঁড়ি কাড়ি কাড়ি ঔষধ গিলিতে হয় না, যেমন সহ্য হয় ডাল, ভাত তরকারী খায়। দেখিতে দেখিতে ছেলের দিব্য শরীর হইল। হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ—দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। রাজার স্ফূর্ত্তি দেখে কে? রাণীর মুখে হাসি আর ধরে না। পাত্র মিত্র, সভাসদ সকলের মুখেই হাসি।

রাজা দেখেন, রাণী দেখেন, পাত্র মিত্র দেখে—সকলেই ছেলে দেখে, কিন্তু কোলে আর কেউ করে না। রাজার নিষেধ—তাঁহার ছেলে খেলিবে, বেড়াইবে, পড়িবে, কিন্তু কোলে করিয়া আর তাহাকে কেউ আটক করিবে না। রাজার ছেলে হৃষ্ট পুষ্ট হইল, হাড়ে মাংসে বাড়িতে লাগিল।

এই কথাটি আসল জিনিস
জেনে রেখ সবে,
মোটা হবে বৃষ্টি বাতাস
সহ্য যত হবে।
বৃষ্টি বাতাস রৌদ্র আলো,
ভগবানের দান,
এতেই মানুষ বেঁচে থাকে
তাজা রাখে প্রাণ।

বিশুদ্ধ বায়ু।

(১)

তেমন ঝড় কেউ কখনো দেখে নাই। সমুদ্র লাফাইয়া লাফাইয়া সারা আকাশটার গায়েই জল ছড়াইয়া দিতেছে, আর সেই অসীম সমুদ্রের উপর জাহাজখানি একবার এদিকে একবার ওদিকে কাৎ হইয়া ডুবু ডুবু হইয়া উঠিতেছিল। রাত্রিকাল, তার উপর সমুদ্রের এই ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন।

যাত্রীদের মধ্যে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল, নাবিকদের মুখ শুকাইয়া, হাত পা অবশ হইতেছিল—প্রাণের আশা আর নাই। জাহজের কাপ্তেন দেখিলেন—মহা বিপদ! যাত্রীদের আর্ত্তনাদে নাবিকরা বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িতেছে, বিপদের সময় ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়িলে জাহাজ রক্ষা করিবার কোন উপায়ই থাকিবে না, কাপ্তেন হুকুম দিলেন—যাত্রীদের সব নীচে ডেকের মধ্যে একটা ঘরে রাখিয়া আইস। সেখানে ওরা যত পারে চীৎকার করুক। তারপর ঝড়-বৃষ্টি থামিলে, সমুদ্র শান্ত হইলে,

বিপদ কাটিয়া গেলে আবার উহাদের এখানে আসিতে দেওয়া হইবে।

যাত্রীরা কিছুতেই যাইবে না। কিন্তু কাপ্তেনও ছাড়িলেন না। নাবিকগণ ঠেলিয়া ঠুলিয়া যাত্রীদের লইয়া ডেকের মধ্যেএকটা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়া আসিল।

কাপ্তেন সারারাত তুফানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জাহাজ-খানি বাঁচাইলেন। ভোরের দিকে সমুদ্র গর্জ্জন স্তব্ধ হইয়া গেল, আকাশে আবার রঙিন আলো ফুটিয়া উঠিল, কাপ্তেন দেখিলেন, বিপদাশঙ্কা দূর হইয়াছে। বলিলেন—এইবার যাত্রীদের আসিতে বল। তাঁহাদের খাওয়া দাওয়ার যোগাড় যাগাড় করিয়া দাও। সারারাত উহাদের বড়ই কষ্ট হইয়াছে।

দুইজন নাবিক কাপ্তেনের আদেশে নীচের তলায় সেই ঘরের দিকে চলিল। তালা খুলিয়া দেখিল, যাত্রীরা সব কামড়ার মেঝেতে লুটাইতেছে! নাবিকদ্বয় ভাবিয়া-ছিল, সারারাত ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তার পর তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই যে এতগুলি লোক সব চিরদিনের তরে চির-নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে! ঠেলাঠেলি করিতেই নাবিকদ্বয়ের চক্ষু স্থির হইয়া গেল।

এ যে সব প্রাণহীন দেহ!

নাবিকদ্বয় উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া কাপ্তেনকে খবর দিল, কাপ্তেন আসিলেন; জাহাজের ডাক্তার এতক্ষণ কোথায় ছিলেন বলা যায় না, তিনিও আসিলেন। কাহারও মুখে আর কথা সরে না।

অনেকক্ষণ পরে ডাক্তার বলিলেন—এইটুকু ঘরে এতগুলো লোককে বন্ধ করা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। এত ছোট ঘরে, তাজা হাওয়া আসিবার যাইবার পথ বন্ধ করিলে লোক কি কখন বাঁচিতে পারে।

বাতাস না হইলে মানুষ বাঁচে না। কেন?—সেই কথাই বলিতেছি।

বাতাসে এক রকম গ্যাস আছে—অক্সিজেন তার নাম। এই গ্যাস অনবরত রক্তের সঙ্গে না মিশিলে মানুষের শরীর ভাল থাকে না। কাজেই এই অক্সিজেনের জন্যই বাতাসের দরকার।

এখন ব্যাপারটা কি হয় জান? আমরা যখন নিশ্বাস লই, তখন সেই বায়ু নাক কিম্বা মুখ দিয়া সরাসর ফুসফুসে যাইয়া উপস্থিত হয়। আমাদের রক্তের ধারাও বহে ঐ ফুসফুসের মধ্যে। সুতরাং সেখানে দুজনকার সাক্ষাৎ হয়।

তোমাদের রক্তের ইতিহাসটা একটু বলিয়া রাখি। ফুসফুসের ভিতর খুব ছোট্ট পাতলা এক রকম রক্ত-বহ-নালী আছে—ঐ নালীর ভিতর দিয়া রক্ত বহিয়া থাকে। ঐ নালীগুলি ভারি পাতলা,—এত পাতলা যে অক্সিজেন স্বচ্ছন্দে ঐ নালী পার হইয়া রক্তের সঙ্গে মিশিতে পারে, কিন্তু এমনই মজা, রক্ত কিন্তু বাহিরে যাইতে পারে না। এখন আমরা যে নিশ্বাস লই সে বাতাস কোথায় যায় তা ত জানিলে, আমরা যে নিশ্বাস ফেলি সে বাতাস কোথা হইতে আসে জান কি? এদিকে অক্সিজেন গ্যাস ত রক্তের ভিতরে যাইয়া ঢুকিল, সঙ্গে সঙ্গে আর এক প্রকার দূষিত গ্যাস রক্তের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নিশ্বাসের সহিত নির্গত হইয়া যায়। কিন্তু এই যে বাতাস শরীরের মধ্যে ঢুকিল আর বাহির হইয়া গেল—ইহারই মধ্যে কত কাজই না হইয়া গেল যেই বাতাস শরীরের মধ্যে ঢুকিল, অমনি রক্ত, শরীরে পক্ষে উপকারী যে গ্যাস তাহা লইয়া শরীরের পক্ষে অনুপকারী যে গ্যাস জমা হইয়াছিল তাহা ঐ বাতাসের সঙ্গে নির্গত করিয়া দিল। সুতরাং নিশ্বাস ফেলিবার সময় যে বাতাস আমাদের শরীর হইতে বাহির হইয়া আসে—শরীরের জন্য তাহা আর কোন কাজেই লাগে না। কারণ তাহাতে

উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেন গ্যাস ত থাকেই না; বরং যা থাকে তা শরীরের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপকারী—এবং অনুপকারী বলিয়াই শরীর বহুপূর্ব্বে তাহাকে নিশ্বাসের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে।

এমন একটি যদি কাচের ঘর তৈরী করা হয়, যার চারিদিক বন্ধ, এবং তাহারই মধ্যে যদি একটি মানুষকে রাখা হয়, তাহা হইলে কিছুকালের মধ্যেই ঘরের ভিতরকার হাওয়ায় যেটুকু অক্সিজেন গ্যাস থাকিবে তাহার অধিকাংশই রক্ত খাইয়া লইবে—সুতরাং ঘরে যাহা থাকিবে তাহা রক্ত কর্ত্তৃক নির্গত দূষিত গ্যাস—নিশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া আসিয়াছে। তাহার পরই মানুষটি উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেন গ্যাসের অভাবে অজ্ঞান হইয়া পড়িবে—এবং মারা যাইবে—কারণ, সেই দূষিত গ্যাস শরীরের ভিতর ঢুকিলে উপকার ত দূরের কথা বরং অপকারই হইবে।

তোমরা ঘরে বসিয়াই এক রকম পরীক্ষা করিতে পার। একটা ছোট মোমবাতি জ্বালিয়া একটা বড় কাচের পাত্র ঢাকা দেও। তাহার পর কাচের পাত্রে যে সবস্থানে বাতাস চলাচলের পথ থাকিবে সেগুলি কোন কিছু দ্বারা বন্ধ করিয়া দেও, এবং দেখ কি হয়? খানিকক্ষণের

মধ্যেই এই আলোটা কাচের পাত্রটীর ভিতরের সমস্ত অক্সিজেন গ্যাস পোড়াইয়া ফেলিবে, এবং তাহার পর বাহির হইতে আর অক্সিজেন গ্যাস না পাইয়া আলোটি নিভিয়া যাইবে।

আমাদের দেশের অনেক লোকের একটা ভুল ধারণা আছে—তাহারা সচরাচর ঘরের জানালা দরজা সব বন্ধ করিয়া শোয়—পাছে অসুখ বিসুখ করে, ঠাণ্ডা লাগে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। বাহিরের বিশুদ্ধ হাওয়া না পাইলে মানুষের শরীর ভাল থাকিতে পারে না। ডাক্তারেরা বলেন, শরীরের উপর কোন একটা আচ্ছাদন দিয়া ঘরের সব দরজা খুলিয়া শোওয়া উচিত—তাহাতে শরীরের কোন ক্ষতি ত হয়ই না, বরং উপকারই হয়। আর যাহারা রোগের ভয়ে দরজা জানালা সব বন্ধ করিয়া থাকে তাহাদিগকেই রোগে আগে ধরে। এই কারণেই আমাদের দেশের কত লোকই না রোগে ভুগিতেছে।

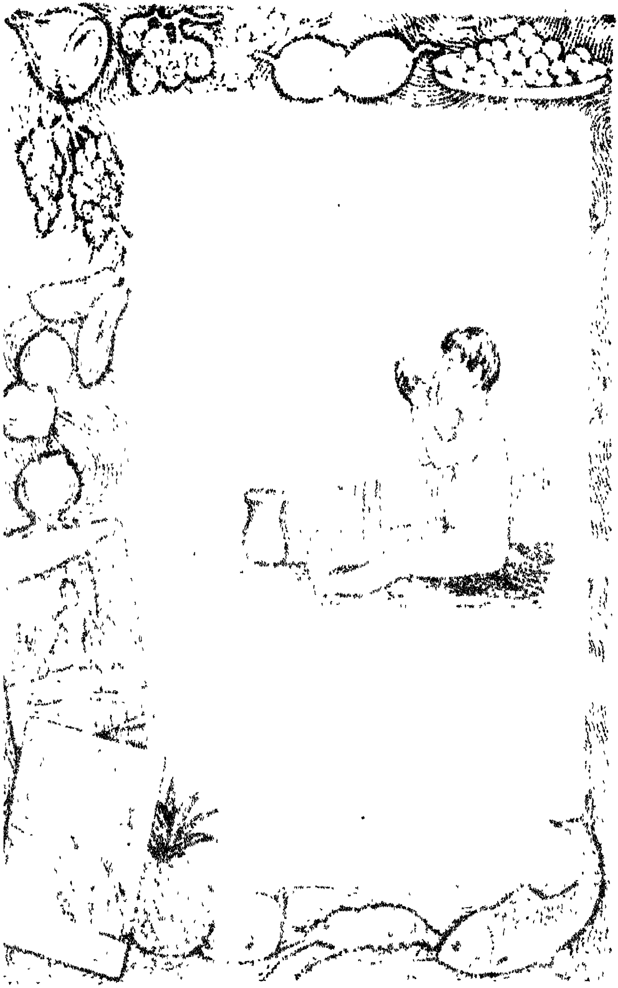
বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করিতে পারিলে মানুষের অর্দ্ধেক রোগ সারিয়া যায়। এমন যে ভীষণ ক্ষয় রোগ—তাহার প্রতিকারের প্রধান উপায় বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করা। স্বভাবের নিয়মই এই, মানুষ বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবে—মানুষ অপ্রাকৃত ভাবে কতকগুলি বন্ধ বাড়ীঘর করিয়া

প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাইলে তাহাকে ত রোগে ব্যায়ারামে ভুগিতেই হইবে।

যাহারা সহরে থাকে এই কারণেই তাহাদের শরীর খারাপ হয়। প্রত্যহ তাহাদের অন্ততঃ দুবার করিয়া কোন খোলা যায়গায় বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করা উচিত।

আর একটা বিষয়ে সকলেই দৃষ্টি দিবে। রাত্রে শুইবার সময় যাহাতে সব জানালা দরজাগুলি খোলা থাকে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে—যেন ঘরের ভিতর দিয়া বাতাস যাতায়াত করিতে পারে। আর পারতপক্ষে বেশী লোক এক ঘরে শুইবে না। ঘরের জানালা দরজা যদি তেমন বন্ধ থাকে, তবে ঘরে যেন অনেক লোক না থাকে।

বিশুদ্ধ বায়ু মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে। তাহার প্রতি সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত।



নিয়মিত আহার।

পালেদের বাড়ী নিমন্ত্রণ, মহা ধুমধাম হৈ চৈ, লুচি মণ্ডার ছড়াছড়ি। নিমন্ত্রণ আসরে রাম, শ্যাম, যদু সবাই ছিল, আর ছিল আধমণি কৈলাস। সে একাই আসর জমাইয়া রাখিয়াছিল। তাহার কাণ্ড কারখানা দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়াছিল।

কৈলাস খাইতে পারিত অসাধারণ, ঝাঁকায় ঝাঁকায় লুচি, হাঁড়ি হাঁড়ি দই সন্দেশ সে একেবারে খাইয়া ফেলিত। পাকা আধ মণ সে অকাতরে উদরের গর্ত্তে ফেলিয়া দিত, তাই লোকে তাকে ডাকিত আধমণি কৈলাস। এ হেন কৈলাস, সেদিন পালেদের বাড়ী নিমন্ত্রণে আসিয়াছিল।

সকলেই কৈলাসের খাওয়া অবাক হইয়া দেখিতেছিল। তাহার পাশেই বসিয়াছিল রামধন নামে একটী পেট রোগা জীর্ণ ছেলে। যদিও সে এদিকে কিছু পেটুক ছিল, কিন্তু খাইতে সে তেমন কিছুই পারিত

না। তাহার পাশেই বসিয়া কৈলাস যে অদ্ভুত কার্য্য করিতেছিল তাহাই সে বিস্মিত নেত্রে দেখিতেছিল।

পালেদের বাড়ীর নিমন্ত্রণের জের—পরদিন হরিধন ডাক্তার বেজায় ব্যস্ত। সকাল হইতে আর এতটুকু অবসর নাই। অপরিমিত ভোজনের ফলে কতলোকের পেটের অসুখ হইয়াছে। দলে দলে লোক আসিতেছিল সেই ডাক্তার বাবুর নিকট হইতে ঔষধ লইতে। সেই দলের মধ্যে আমাদের সেই পেটরোগা রামধনও ছিল। গত দিনে সে খাইতে বসিয়াছিল ঠিক কৈলাসের পাশেই, তাই সকলেই তাকে চিনিতে পারিল। দলের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল,

"আচ্ছা ডাক্তারবাবু, সবাই ত আমরা এক সঙ্গে নিমন্ত্রণ খাইলাম, কিন্তু কতকের হইল অসুখ, আর কতক ত বেশ সুস্থ আছেন, ইহার কারণ কি? এই যে রামধন ছোঁড়া -এ ত কিছুই খায় নাই—উহার হইল অসুখ। আর কৈলাস যে একাই পঞ্চাশ জনের খাবার খাইল, কই তাহার ত কিছুই হইল না। সে বেশ সুস্থ সবল ভাবে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে।

ডাক্তারবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সকলের সমান সহ্য হয় না তাই যাহার যেরূপ সহ্য হয় তাহার সেইরূপ

আহার করা উচিত, কমও না, বেশীও না। কৈলাস খাইতে পারে আধমণ, কাল সে খাইয়াছেও আধমণ, সুতরাং তাহার অসুখ হইবে কেন? আধমণের বেশী খাইলে তাহার অবস্থাটা আপনাদেরই মত হইত। রামধন সচরাচর যাহা খাইয়া হজম করিতে পারে, তাহার চাইতে কাল সে বেশী খাইয়াছিল, তাই তাহার এই দুর্দ্দশা।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "এমন ধারা কেন হয়, একজন বেশ খায় দায়, হজম করে, আর একজন জন্ম পেটরোগা, কিছু খাইয়া হজম করিতে পারে না—এই সব বেচারীদের কি কোন উপায় নাই?"

ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, কি জানেন, মানুষের স্বাস্থ্য সবটাই তাহার নিজের উপর নির্ভর করে না। পিতা-মাতার স্বাস্থ্যানুযায়ীও অনেক সময়ে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য হয়। যদি কেহ পিতামাতার স্বাস্থ্য পাইয়া জন্মাবধিই পেট রোগা হয় তবে তাহাকে খুব সাবধানে থাকিতে হয় এবং নিজের পুরুষকার ও সংযমের ফলে সে শীঘ্রই আবার সবল ও সুস্থ হইতে পারে। আর কেহ কেহ পিতামাতার সুন্দর স্বাস্থ্য পাইয়াও অত্যাচার করিয়া শেষে রামধনের মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তবে একটা জিনিষ আপনারা জানিয়া রাখুন, স্বাস্থ্যের ভাল মন্দ অল্প কিছু

গোড়ার দিকে পিতামাতার উপর নির্ভর করিলেও বেশীর ভাগ নির্ভর করে নিজের উপর। যেরূপ যার সহ্য হয়, মানুষ যদি সেইরূপ আহার করে তবে অসুখ বিসুখ বড় একটা হয় না। এই যেমন, যে দৈহিক পরিশ্রম করে বেশী, তার তদ্রুপযোগী আহার করা আবশ্যক, এবং সে সেরূপ আহার করিয়া হজমও করিতে পারে। কিন্তু যে শারীরিক পরিশ্রম করে না, তাকিয়া হেলান দিয়া ও দিবা নিদ্রায় দিন কাটায় তাহার আহার সেইরূপ লঘু হওয়া দরকার। শারীরিক পরিশ্রম না করিলে খাবার তেমন হজম হয় না, আর হজমের ব্যবস্থা না করিয়া অতিরিক্ত ভোজন করিলে তাহার বিষময় ফল ফলিবেই।"

পরে ডাক্তার বাবু হাসিয়া বলিলেন, "এইরূপ নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ আছে বলিয়াই আমাদের ব্যবসা চলিতেছে। সকলেই যদি পরিমিত আহার করে, নিয়ম মত চলে, তবে ত আমাদের ব্যবসা একরূপ তুলিয়াই দিতে হয় ও তাহা হইলে আপনাদেরও আজ এখানে শুভাগমন হইত না।"

সকলেই অপরাধীর ন্যায় এ-ওর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

আহার পরিমিত হওয়া দরকার। যাহার যেরূপ সহ্য হয় তাহার তদতিরিক্ত কিম্বা তদপেক্ষা কম আহার

করা অন্যায়। যাহারা শারীরিক পরিশ্রম করেন তাহাদের তদুপযোগী সারবান আহার্য্য খাওয়া উচিত, আর শারীরিক পরিশ্রম দ্বারাই হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যাহারা অলস ভাবে দিন যাপন করেন তাহাদের আহার সেইরূপ লঘু হওয়া উচিত—নতুবা অজীর্ণ হইবেই হইবে।



খাদ্যের গুণাগুণ।

—:*:—

এক মহা যুদ্ধের ভিতর মারামারি কাটাকাটির মাঝখানে এক মহা তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

যুদ্ধ ভীষণ ভাবে চলিয়াছিল। দুই পক্ষের হত আহত স্তূপীকৃত হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িয়াছিল। তাহারই মধ্য দিয়া প্রাণপাত পরিশ্রমে শুশ্রূষাকারিণীরা আহতদের বহিয়া লইয়া হাসপাতালে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। সেখানে সে কি করুণ মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য, আহত মুমূর্ষুদের সে কি গোঙরাণি, দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় করুণাময় ঈশ্বরের এ কি বিচার! এই যুদ্ধের সার্থকতা কি?—এই বীভৎস দৃশ্য সংঘটিত করিয়া মঙ্গলময় ঈশ্বরের কি মহান্ উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে?

বিনা উদ্দেশ্যে পরমেশ্বরের কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। আহতদের মরণান্তকর অবস্থার ভিতর দিয়াই বিশ্বপিতার কল্যাণকর এক মহাসত্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

সেই যুদ্ধেই এলেক্সিস্ সেণ্ট মার্টিন (Alexis St.

Martin) নামক এক সেনানীর পেটে গুলি লাগিয়া পেটের সম্মুখের দিকটা উড়িয়া গিয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে রোগীকে বাঁচান দায় হইয়া পড়ে, কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসার পর দেখা গেল রোগী বাঁচিয়া উঠিয়াছে। শুধু তাই নয়, রোগীর পেটের সামনের দিকটায় ছিদ্র হওয়ায় পেটের ভিতরকার যন্ত্রপাতি সব প্রত্যক্ষ দেখা যাইতে লাগিল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। পেটের ভিতরকার যন্ত্রপাতির চলাচল, কার্য্য দেখিবার সুবিধা এমনভাবে ডাক্তারদের আর হয় নাই। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার বোমণ্ট (**Beaumont**) গবেষণায় লাগিয়া গেলেন :

টপ করিয়া একখণ্ড রুটি মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিলে তাহার পর সে রুটির কি অবস্থা হয়, কোথায় কেমন করিয়া যায় তাহা আমাদের জানিবার উপায় ছিল না। কিন্তু ঐ সৈনিকের পেটের ভিতরের যন্ত্রপাতি ছিল অনাবৃত, তাই ঐ সব যন্ত্রপাতির চলাচল ডাক্তারেরা নিবিষ্ট মনে দেখিতে লাগিলেন। রুটিখানি যাইয়া ত পেটের মধ্যে পঁহুছিল, তাহার পর তাহার কি অবস্থা হয়, ঐ রুটিখানি হজম করিতে কত সময় লাগে, এই সবই তখন ডাক্তারেরা দেখিয়া বুঝিলেন। শুধুই কি রুটী, যত রকমের খাবার আছে সব ঐ সৈনিককে দিয়া খাও-

য়াইয়া প্রত্যেক রকমের খাবার হজম করিতে কত সময় লাগে ডাক্তারেরা দেখিয়া শুনিয়া তাহার একটা নির্ঘণ্ট তৈরী করিয়া ফেলিলেন। তবে তোমারা একটা জিনিষ মনে রাখিও, এই নির্ঘণ্টটা তৈরী হইয়াছিল, সেই সৈনিকে হজমশক্তি দেখিয়া। তোমার, আমার, সকলের হজমশক্তি আর কিছু এক নয়। সে সৈনিকের হজমশক্তি ছিল খুব ভাল, তাই কোন একটা খাবার সে সৈনিকের যদি তিন ঘণ্টা হজম করিতে লাগিত, তোমার আমার হয়ত সেই খাবারটাই হজম করিতে ৫ ঘণ্টা লাগিয়া যাইবে। তবে কোন জিনিষ কি সময়ে হজম করা যায়, তাহারই একটা তুলনা মূলক পরিচয় পাওয় যায়।

জল বায়ু না হইলে যেমন মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, খাদ্য না হইলেও তেমনি মানুষের বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। আমাদের শরীরটি যেন একটি ইঞ্জিন। ইঞ্জিন চালাইবার জন্য যেমন অনবরত কয়লার দরকার হয়, আমাদেরও শরীর কার্য্যক্ষম রাখিবার জন্য, বাঁচিবার জন্য, অনবরত খাদ্যের দরকার হয়, ইঞ্জিনে অল্প কয়লা দিলে তাহা যেমন অধিককাল চলে না, যথোপযুক্ত খাদ্যের সরবরাহ না পাইলে শরীর তেমনি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

এই খাদ্যের ভাল মন্দের উপর শরীরের স্বাস্থ্য, সুখ,

সৌন্দর্য্য সব নির্ভর করে। তবে খাদ্যের ভাল মন্দের বিচার আস্বাদন দ্বারা স্থির হয় না, কিরূপ খাদ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, কিরূপ খাদ্য শরীরের কোন্ অবস্থায় উপযোগী এই বিচারের উপরেই খাদ্যের ভালমন্দ নির্ভর করে। আমাদের কথাবার্ত্তা, অঙ্গাদি চালনা, নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে শরীরের ক্ষয় হইতেছে, এই ক্ষয় পূরণ হয় খাদ্য গ্রহণের দ্বারা। তবে শুধু খাদ্য গ্রহণ করিলেই হইবে না, এমন খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে যাহা সহজে হজম হইয়া রক্তে পরিণত হয়।

আমাদের শরীরকে কার্য্যক্ষম রাখিতে হইলে বিভিন্ন উপাদানের খাদ্যের আবশ্যক হয়, কোনটি বা আমিষ জাতীয় কোনটি বা স্নেহ জাতীয়, কোনটি বা শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয়, কোনটি বা লবণ জাতীয়, কোনটি বা জলীয় উপাদানে গঠিত। আমাদের প্রত্যহ এমন সব খাদ্য আহার করিতে হইবে, যাহাতে এই সব উপাদানই শরীরের প্রয়োজন মত বর্ত্তমান থাকে। কোন জাতীয় উপাদান কত পরিমাণ শরীরের পক্ষে দরকার তাহার বিচার করিয়া আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব নয়, তবে সাধারণতঃ দেশ ও আচারানুমোদিত খাদ্যই গ্রহণ করা শ্রেয়। এদেশের এবং অন্য দেশের

আচারানুমোদিত খাদ্যের খিচুরি সংমিশ্রণে অনেককেই পরে অনুতাপ করিতে হয়। সাহেবেরা মাছ মাংস সাধারণতঃ বেশীই আহার করে, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রচুর কাঁচা ও সিদ্ধ তরকারী, ফলমূলও গ্রহণ করে, আমাদের দেশে অনেকে সাহেবদের অনুকরণে মাংস প্রচুর পরিমাণে আহার করেন, কিন্তু তরকারী ফলমূল সেই অনুযায়ী আহার করেন না। ফল দাঁড়ায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহারা নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হন।

পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় সব উপাদানগুলিই দুগ্ধের মধ্যে বর্ত্তমান। এমন একদিন ছিল যখন প্রত্যেক ভারতবাসীই অন্যান্য খাদ্যের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ খাইতে পাইত, কাজেই শাক সব্জীর উপর সাধারণতঃ ভারতবাসীর জীবন নির্ভর করিলেও খাদ্যের সহিত দুগ্ধের সংমিশ্রণে আবশ্যকীয় কোন উপাদানেরই অভাব শরীরে হইত না। কিন্তু আজকাল ভারতবাসী দুগ্ধ আর বড় একটা চোখে দেখিতে পায় না, কাজেই আমাদের খাদ্যের মধ্যে আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য যথা, মৎস্য, মাংস, ছানা, দাল, ঘৃত, তৈল প্রভৃতির যথেষ্ট প্রচলন হওয়া দরকার।

আমরা উপরে যে সকল উপাদানের নাম করিয়াছি,

তাহা ব্যতীতও আরও কতকগুলি উপাদান আছে, যাহাকে ইংরাজিতে "ভাইটামিন" বলে। দুগ্ধ, ডিম্ব, লেবু, টাটকা ফল, জন্তুর চর্ব্বি, এই সব পদার্থে ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। আহার্য্যে ভাইটামিনের অভাব হইলে রিকেট স্, স্কার্ভি, বেরি বেরি প্রভৃতি রোগ হয়। চাউল মাজিবার সময়, রন্ধনের সময় খাদ্যের ভাইটামিন অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং শরীর সংরক্ষণের জন্য খাদ্যের মধ্যে কিছু কাঁচাদ্রব্য থাকা মন্দ নয়। একটা বিষয় আমাদের মনে রাখা উচিত। আমাদের পিতা, পিতামহ যে খাদ্য গ্রহণ করিতেন, সাধারণতঃ আমাদের সেই সব খাদ্যই গ্রহণ করা উচিত, তাহা অপেক্ষা বেশী পরিবর্ত্তন অনেক সময়েই শরীরে সহ্য হয় না। পরিশ্রমানুযায়ী পরিমিত আহার সকলের করা উচিত সে কথা তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এই খাদ্য বিচারের কথা বলিতে বলিতে একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। জগৎ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মেটস্নিকফ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, দধিতে যে ল্যাক্‌টিক এসিড জীবাণু আছে তাহা অন্ত্রের মধ্যস্থ অনিষ্টকারী জীবাণুদের নষ্ট করিয়া ফেলে, কাজেই নিয়মিত যাঁহারা দধি ব্যবহার করেন তাঁহারা দীর্ঘকাল নীরোগ

হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারেন। দুষ্ট জীবাণুদের নষ্ট করিতে দধি বিশেষ উপযোগী, তাহার উপর ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, এখানে আশা করি দধির উপকারিতা কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না।

আর্য্যঋষিগণ আর একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলিয়াছেন। তাঁহারা "বিরুদ্ধাহার" সর্ব্বসময়ে সর্ব্বকালে দোষণীয় বলিয়া গিয়াছেন। মাংস ও দুগ্ধ একসময় গ্রহণ করা এক রকম বিষ খাওয়ার সামিল—তোমরা কখনই মাংস ও দুগ্ধ এক সময়ে গ্রহণ করিও না।

আজকাল বাজার ভেজাল খাদ্য দ্রব্যে ছাইয়া গিয়াছে। ভেজাল দ্রব্য খাওয়াও যা বিষ খাওয়াও তাই। বরং না খাইয়া কৃশ হওয়া ভাল, তথাপি ভেজাল দ্রব্য খাইয়া চিরকালের জন্য স্বাস্থ্য নষ্ট করা ভাল নয়। আহার্য্য দ্রব্যগুলি যাহাতে খাঁটি হয় তাহার প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ভেজাল দ্রব্যের এত অধিক প্রচলন না হইলে সহরের অর্দ্ধেক রোগ লোপ পাইত।

দেহযন্ত্রের মধ্যে খাদ্য কিরূপে পরিপাক হয় আমরা "দেহযন্ত্র" অধ্যায়ে তাহা বলিয়াছি। পরিপাক না হইলে মাংস, ডিম্বের মত সারবান আহার্য্যও শরীরে বিষবৎ

কার্য্য করে; আবার সামান্য ফলমূলও পরিপাক করিতে পারিলে শরীরকে স্বাস্থ্যবান করিতে বিশেষ সাহায্য করে। কি খাদ্য কাহার কিরূপ সহ্য হয়, সে সম্বন্ধে কোন বাঁধা ধরা নিয়ম থাকিতে পারে না। আমার পক্ষে যাহা উপযুক্ত অন্যের পক্ষে হয়ত তাহাই অনুপযুক্ত। প্রত্যেক-কেই নিজে বিচার করিতে হইবে, কোন খাদ্য তাহার স্বাস্থ্যের অনুকূল।

খাদ্য সম্বন্ধে আর্য্যঋষি ধন্বন্তরিকল্প মহর্ষি চরক লিখিয়া গিয়াছেন,

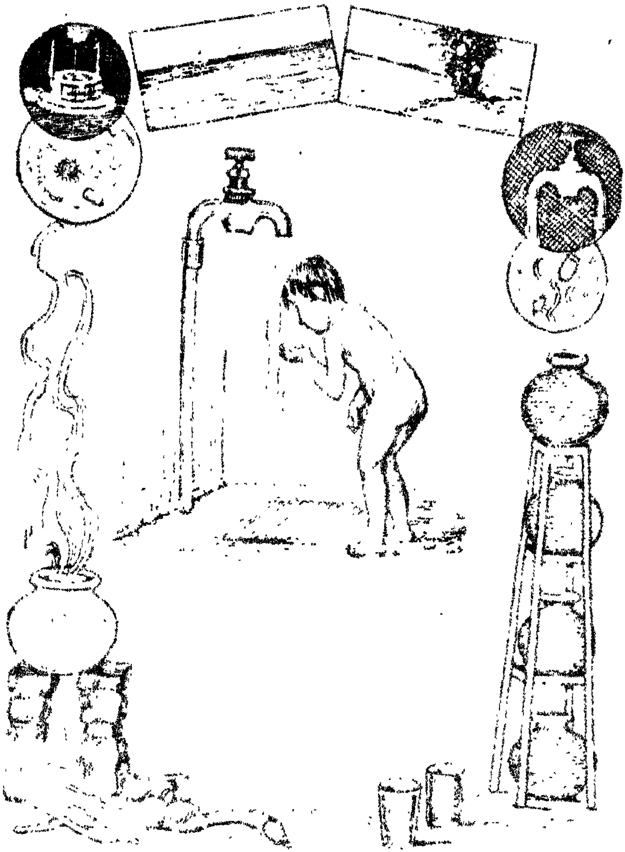
"মাত্রাশী স্যাৎ। আহারমাত্রা পুনরগ্নি বলাপেক্ষিণী
যাবদ্ধ্যস্যাশনমশিত মনুপহত্য প্রকৃতিং যথাকালং
জরাংগচ্ছতি তাবদস্য মাত্রাপ্রমাণং বেদিতব্যম্ভবতি।"

পরিমিত আহার করিবে। কিন্তু তাহার মাত্রা অগ্নিবল সাপেক্ষ। যত দূর আহার্য্য বিনা আয়াসে যথাকালে জীর্ণ হইবে তাহাই খাদ্যের মাত্রা।

বিশুদ্ধ পানীয় জল

সেবার রায়পুর গ্রামের ভীষণ মহামারীর কথা হয়ত অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে। ভীষণ মহাকাল কলেরা আসিয়া সেই ক্ষুদ্র গ্রামটীকে যেন একেবারে তোলপাড় করিয়া দিয়া গিয়াছিল। রোগীর মুখে জল দিতে নীরোগ সুস্থ লোক বড় একটা কেহ ছিল না। গ্রামের সর্ব্বত্রই হাহাকার।

চিকিৎসা—চিকিৎসকের বালাই সে সময়ে ছিল না। সব রোগী। সহর হইতে জনকয়েক স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া তাহাদের মুখে জল, রোগের ঔষধ দেন। ধীরে ধীরে সেবা শুশ্রূষার পর রোগের প্রথম বেগটা একটু কমিলেই স্বেচ্ছাসেবকেরা গ্রামের চারিপাশে তদন্ত আরম্ভ করিলেন—কেন এমন রোগ হয়। তদন্তের ফলে প্রকাশ পাইল জলই এই ভীষণ মহামারীর জন্য দায়ী। গ্রামে পুষ্করিণীর অভাব ছিল না, কিন্তু পানীয় জলের জন্য কোন পুষ্করিণীই ভিন্ন করিয়া রাখা হয় নাই। গ্রামে প্রায়ই দেখা যায়, পুষ্করিণীর পাশেই পায়খানা; অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের পরই তাহা হইতে নির্গত মলমূত্র আসিয়া পুষ্করিণীতে পরে,



পুষ্করিণীর চারিপাশে বসিয়া নানা জনে উচ্ছিষ্ট বাসনাদি, কাপড় ইত্যাদি ধুইতেছে, মাজিতেছে, কেহ বা সর্ব্বাঙ্গ অবগাহন করিয়া সেই জলেই স্নান করিতেছে, কেহ বা গরু মহিষ প্রভৃতি পশুকে সেই জলে স্নান করাইতেছে, আর কেহ বা এই নোঙরা জলই পানের জন্য কলসী ভরিয়া লইয়া যাইতেছে। এই জল পান করিলেও যদি অসুখ না হয় ত কিসে হইবে? জল মানুষের একটী অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী, এই জল না হইলে মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু এই জল আবার বিশুদ্ধ না হইলে শরীরে তাহা বিষের ন্যায়ই কার্য্য করিয়া থাকে।

যাহারা পাতকূয়ার জল পান করেন তাহাদের বিশেষ নজর রাখিতে হইবে যে পাতকূয়ার তলা পর্য্যন্ত ভাল পাকা গাঁথনী আছে কিনা, নতুবা আশে পাশের পায়খানা, কিম্বা গোয়াল ঘর হইতে নির্গত ময়লা রস মাটিতে চুঁইয়া চুঁইয়া আশেপাশের পাতকূয়ার জল ময়লা করিয়া ফেলে। গ্রামের মধ্যে ভাল দেখিয়া তিন চারিটি পাতকূয়া পানীয় জলের জন্য ভিন্ন করিয়া রাখা উচিত। সেই সব পাত-কূয়ার ভিতর যাহার তাহার পাত্র ডুবাইতে দেওয়া উচিত নয়; গ্রামের মিউনিসিপ্যালিটির কিম্বা দশজনের চাঁদা করিয়া এমন একজন লোক রাখা উচিত যে পাতকূয়া

হইতে জল তুলিয়া, কিছুদূরে সবাইকে সেই বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করিবে। পাতকুয়ার নিকটে কাহাকেও আসিতে দেওয়া উচিত নহে। পাতকুয়ার উপরটাও কাঠ দিয়া ঢাকিয়া রাখা উচিত।

জল সংশোধিত করিয়া তাহার পর পান করা উচিত। সংশোধনের নানাপ্রকার উপায় আছে। প্রথমেই জলটাকে আগুনের জ্বালে ভালরূপে ফুটাইয়া লইতে হয়, এইরূপ ফুটাইয়া লইলে রোগের যত জীবাণু সব মরিয়া যায়। এখন জলের মধ্যে যদি কিছু ময়লা থাকে তাহা পরিষ্কার করিবার জন্য জল ফুটাইবার আগে উহা থিতাইয়া লওয়া উচিৎ। একদিন না নাড়িয়া চাড়িয়া রাখিয়া দিলেই জল থিতাইয়া যায়; তখন উপরের পরিষ্কার থিতান জল ঢালিয়া লইলেই হইল।

বিলাতী ফিল্টারের মধ্যে জল রাখিয়া দিলে, একরূপ শক্ত কাঠকয়লার ভিতর চুপষাইয়া নিম্নে পরিষ্কার জল নির্গত হয়। আমাদের দেশেও অনেকে দেশী ফিল্টার তৈয়ার করিয়া লইয়াছেন। সাধারণতঃ গৃহস্থেরা একটি করিয়া কলসী থাকিতে পারে এরূপ ফাঁকযুক্ত চারটি থাপ বিশিষ্ট একটি কাঠের র‍্যাক প্রস্তুত করেন। ঐ ৪টি থাপে ৪টি কলস বসাইয়া দেওয়া হয়। উপরের



গ্রামে প্রায়ই দেখা যায় পুষ্করিণীর পাশেই পায়খানা, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের পরই তাহা হইতে নির্গত মলমূত্র আসিয়া পুষ্করিণীতে পড়ে, পুষ্করিণীর চারিপাশে বসিয়া নানা জনে উচ্ছিষ্ট বাসনাদি, কাপড় ইত্যাদি ধুইতেছে, মাজিতেছে, কেহ বা সর্ব্বাঙ্গ অবগাহন করিয়া সেই জলেই স্নান করিতেছে।

স্বাস্থ্য চিত্রে

তিনটী কলসের তলের দিকে একটি করিয়া ফুটা থাকে, যাহাতে জল ফোটা ফোটা পড়িতে পারে। এখন প্রথম ফুটা কলসীতে গরম জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় কলসীতে কিছু কাঠ কয়লা এবং তৃতীয় কলসীতে কিছু পরিষ্কার বালি রাখিতে হইবে। এখন উপরের কলসীর জল ফোটা ফোটা করিয়া পড়িয়া, নীচের কয়লার কলসীর মধ্যে পড়ে। এবং সেখান হইতে আবার ফোটা ফোটা করিয়া পড়িয়া বালির কলসীতে পড়ে। বালির কলসী হইতে জল একেবারে পরিষ্কার হইয়া নিচের কলসীতে আসিয়া জমে। অনেকের ধারণা যে এইরূপ ফিল্টার করা জল পান করিলে আর কোন আশঙ্কার কারণ থাকে না। ইহা ঠিক নহে ; কারণ ঐ সকল বালি এবং কয়লার মধ্যে নানাপ্রকার রোগের জীবাণু আড্ডা গাড়িয়া থাকে। তবে যদি প্রতিদিন জল ফিল্টার করিবার আগে ঐ সকল বালি এবং কয়লাও ভালরূপে সিদ্ধ করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ জল চলিতে পারে। কিন্তু এই সকল হাঙ্গামা অপেক্ষা থিতান জল ফুটাইয়া লওয়া অনেক সহজ ও কম খরচে হয়।

বাড়ীর পাশে যাহাতে পচা ডোবা, নালা না থাকে তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। পচা জলেই

একরূপ মশা জন্মায়, সেই মশায় কামড়াইলে ম্যালেরিয়া হয়। কাজেই বাড়ীর নিকট পচা ডোবা নালা না থাকে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবে।

পরিষ্কার জলের উপর স্বাস্থ্য সুখ অনেকটাই নির্ভর করে। কাজেই অল্প স্বল্প অসুবিধা হইলেও জলের বিশুদ্ধতার দিকে আমাদের সদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে।



দাঁতের-মর্য্যাদা।

(২)

সে দিন সকালে বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, হঠাৎ ঘোষেদের নলিনী কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া হাজির! ব্যাপার কি? অত বড় ছেলে নলিনী, সে ছোটছেলের মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদে কেন? জিজ্ঞাসা করিতে বলিল, দাঁতে অসহ্য ব্যাথা সে আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। তখন সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া গেল।

আমাদের দেশের অনেকেই দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝে না। তাহাদের যদি ছেলেবেলায় কেহ বলিয়া দিত দাঁতের উপর তাহাদের স্বাস্থ্য কতটা নির্ভর করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা দাঁতের এরূপ অযত্ন করিত না।

আমাদের দাঁত হাড়ের মত শক্ত তা তোমরা সবাই জান। কিন্তু এই শক্ত দাঁতের ভিতরটায় একটুখানি ফাঁপা গর্ত্তে খানিকটা তলতলে নরম জিনিষ আছে। অযত্ন করিলে দাঁত ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং শেষে সেই নরম জিনিসটা বাহির হইয়া পরে। তাহাতে খাবার প্রভৃতি সামন্য কিছু ঢুকিলেই যন্ত্রণা হয়।

দাঁত পরিষ্কার না করিলে নানা প্রকার ময়লা জমে। যে দাঁতে একবার ময়লা ঢুকিয়া গর্ত্ত হইয়াছে, সে দাঁতে ময়লাও জমিতে সুবিধা পায়। প্রতিবার আহারের পর এই ময়লা ভাল করিয়া পরিষ্কার না করিলে, খাবারের যে সব কুচি দাঁতে ঢুকিয়া থাকে তাহা পচিয়া দুর্গন্ধ হয়, এবং তাহা হইতে নানা প্রকার রোগের জীবাণু জন্মাইয়া দাঁতকে ত আরও ক্ষয় করেই, উপরন্তু সেই জীবাণু খাবারের সহিত শরীরের ভিতর ঢুকিয়া নানারূপ রোগের সৃষ্টি করে। খাবারের সঙ্গে ঐ পচা জিনিস পেটের মধ্যে যাইয়াও নানা অনর্থ ঘটায়।

দাঁত পরিষ্কার রাখিতে হইলে প্রত্যহ ভোরে প্রতিবার খাইবার পর নিয়ম মত কোন প্রকার দাঁতের মাজন দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করিবে। আমাদের পল্লীগ্রামে গাছগাছড়ার ডাল, খড়িমাটী, ফিটকিরী প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্যের সংমিশ্রণে নানা প্রকার দাঁতের মাজন তৈরী করা হয়, ইহার যে কোনটী দ্বারাই দাঁত মাজা চলে। আজকাল বাজারেও নানাপ্রকার দাঁতের মাজন পাওয়া যায়। এই সব মাজন দিয়া দাঁত মাজিলে মুখের দুর্গন্ধও অনেকটা কাটিয়া যায়।

দাঁতের সঙ্গে অনেকে দাঁতন ব্যবহার করিয়া থাকেন,

এ অভ্যাসটিও খুব ভাল। আমাদের পল্লীগ্রামে অনেকে নিমের ডাল দিয়া দাঁতন করেন। সহরের প্রায় লোকই দাঁত মাজনের জন্য তৈরী এক রকম ব্রুস আছে, তাহাই ব্যবহার করেন। নিমের ডালের দাঁতন এক পক্ষে খুবই ভাল, কারণ তাহা নিত্যই বদলান যায়। ব্রুস নরম বলিয়া যদিও দাঁতনের পক্ষে খুবই উপযোগী, কিন্তু উহাকে প্রত্যহ পরিষ্কার করিয়া রাখার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়, নতুবা রোগের জীবাণু জমিয়া উপকারের চাইতে ক্ষতিই বেশী করে।

আজকাল সহরে অনেক ভাল ভাল দন্তচিকিৎসক আছেন, যে কোন দাঁত যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিলেই তাহাদের নিকট যাইয়া দাঁত উপড়াইয়া নূতন দাঁত বসান, কিম্বা তাঁহাদের পরামর্শমত কাজ করা উচিত। অনেকে ২।৩ বৎসর অন্তর দন্ত চিকিৎসকদের নিকট যাইয়া দাঁত ভালভাবে পরিষ্কার করিয়া আসেন। দাঁত থাকিতেই যাহারা দাঁতের এইরূপ মর্য্যাদা দেখায় তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কষ্ট পাইতে হয় না।

দীর্ঘজীবন।

—:※:—

বৃদ্ধ হরিহর দাদার বয়স ছিল ১২০ বৎসর। গ্রামের মধ্যে সকলের অপেক্ষা তিনি বয়ঃবৃদ্ধ ছিলেন, তাই সকলেই তাঁহাকে ঠাকুরদা বলিয়া থাকিত। তিনি এত বৃদ্ধ বয়সেও প্রত্যহ সকাল বিকাল দুই বেলা দুই মাইল করিয়া বেড়াইতেন, প্রত্যেক কাজেই যেন তাহার একটা স্ফূর্ত্তি, আনন্দ দেখা যাইত; এ বয়সেও অবসাদ তাঁহার শরীরের ত্রিসীমানায়ও ঘেঁসিতে পারে নাই। আমরা পাড়ার ছেলেরা নিত্যই তাহাকে ঘিরিয়া বসিতাম গল্প শুনিতে, তিনিও তাঁহার ঐ দীর্ঘ জীবনের কত কাহিনীই না আমাদের গল্পের আকারে শুনাইতেন, আমরাও গত যুগের সেই সব অদ্ভুত ব্যাপার অবাক হইয়া শুনিতাম।

সেদিন আকাশটা ছিল মেঘলা। একপশলা বৃষ্টিও হইয়া গিয়াছিল, আমরা ছেলের দল সেদিন ধরিয়া বসিলাম, ঠাকুর্দ্দা আজ আর শীঘ্র আপনার বাড়ী হইতে উঠিতেছি না, একটা বড় রকমের গল্প বলিতে হইবে। ঠাকুর্দ্দা কি বলি, কি বলি করিতেছিলেন, এই সময়

আমাদের পাড়ার রমেশ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা ঠাকুর্দ্দা, সবাই বলে আপনার বয়সের গাছ পাথর নাই, সত্যই কি তাই, আপনি কি কোন কিছু মন্ত্র জানেন, কই কেহই ত আপনার মত দীর্ঘজীবি নয়, ইহার কারণ কি ?" ঠাকুর্দ্দা হাসিয়া বলিলেন, "না ভাই, আমি কোন মন্ত্র জানি না, আর দশজনের মতই আমি সাধারণ মানুষ, তবে কি করিয়া আমি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছি সেই গল্পই আজ তোমাদের বলিব।

মানুষের স্বাস্থ্য বা দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলে স্বাস্থ্যের গোটাকয়েক মূল নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। বিশুদ্ধ বায়ুসেবন, বিশুদ্ধ জলপান, সারবান আহার গ্রহণ, ব্যায়াম, এসব ত স্বাস্থ্যের পক্ষে একেবারেই অপরিহার্য্য, কিন্তু আর কয়েকটি বিষয়েরও দিকে দৃষ্টি না দিলে দীর্ঘ-জীবন ও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করা যায় না।

সংযম—

প্রথমেই আমি সংযমের কথা বলি। আমি সেকেলে লোক এত দীর্ঘকাল বাঁচিয়াছি, কারণ আমার সংযম ছিল। ছেলেবেলায় ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছি, সংসারে প্রবেশ করিয়া কখনও সংযম হারাই নাই। রাস্তায়

মাতাল, মদখোর দেখিয়াছ—তাহারা কখনও দীর্ঘজীবি হইতে পারিবে না। আজকাল অনেকেই দিনে দশবার করিয়া চা খান। সংযমের পথে, স্বাস্থ্যের পক্ষে তাহাও বিশেষ হানিকর। চাতে ট্যানিন্ নামে একপ্রকার বিষ আছে ; উহা ক্রমশঃ পেটের হজমশক্তি নাশ করিয়া শরীরের নানাপ্রকার ক্ষতি করে। অনেকে তামাক হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার দ্রব্য সেবন ও আহার করিয়া সংযমের মাথা খাইতেছেন। শুধু যে তামাক, চা, মদেই সংযমী হইতে হইবে তাহা নয়, জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে সংযমী হইতে হইবে। নিমন্ত্রণের সময় মনে রাখিতে হইবে, আমার যতটা সহ্য হয় ততটাই খাইব, খাবারের লোভে যেন অসংযমী না হই। যাহা আমার শরীরে সহ্য হইবে তদপেক্ষা বেশী খাইলে তাহা শরীরের ক্ষতিই করিবে, কোন উপকারে আসিবে না। আমার এখন বয়স বেশী হইয়াছে, ছেলেবেলায় যাহা খাইয়া স্বচ্ছন্দে আমি হজম করিতাম এখন আর তা পারি না, তাই খাবার মাত্রাও আমি কমাইয়া দিয়াছি। দিনে মাত্র দুইবার আমি খাই। তাও সে খাবারের মাত্রা বয়সের সঙ্গে ক্রমশঃ কমাইয়া দিতেছি.—শরীরের জীর্ণ করিবার ক্ষমতা কমিয়া আসিতেছে কি না! আহারেও এইরূপ সংযম রাখিয়াছি

বলিয়াই কোন দিন আমার শরীর এতটুকু টলে নাই। আহারের ন্যায় অন্যান্য ব্যাপারেও সংযমী হইতে হইবে। বেশী রাত্রি জাগরণ, অতিরিক্ত ব্যায়াম, বহুক্ষণ কোন নির্দোষ ব্যাপারেও লিপ্ত থাকা—এসবেতেও সংযম দরকার। সংযম হারাইলে স্বাস্থ্যবান্ হইতে পারিবে না এ কথাটি বেশ ভাল করিয়া মনে রাখিও।

প্রফুল্লতা—

আর একটা জিনিষ যাহার উপর স্বাস্থ্য অনেকাংশে নির্ভর করে, তাহা হইতেছে প্রফুল্লতা। মনকে সদা প্রফুল্ল রাখিলে জীবনে অনেক শান্তি পাওয়া যায়। প্রফুল্লতা হইল স্বাস্থ্যের দৃঢ় ভিত্তি, এই ভিত্তির উপর স্বাস্থ্যের বাড়ী না তুলিলে, কালে সে বাড়ী ধসিয়া যাইবেই। মানুষের চিরদিন কখনও ভাল ভাবে যায় না। কিন্তু যে সময়ই যেমন হউক না কেন, মনের প্রফুল্লতা কখনও হারাইবে না। নিজের অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে। তোমার অপেক্ষাও যাহাদের অবস্থা খারাপ তাহাদের দিকে নজর রাখিয়া নিজের অবস্থাতে তৃপ্ত থাকিবে, এবং সর্ব্বদা এই কথাটি স্মরণ রাখিবে, "এ্যয়সা দিন নেহি রহেগা।"

অন্য দিকটা একবার ভাবিয়া দেখ। প্রফুল্লতা

হারাইলে মানুষের মেজাজ হয় খিট্‌খিটে, যেন কিছু ভাল লাগে না। বাড়ীর আত্মীয়, পরিজন, চাকর সবারই সঙ্গে কারণে অকারণে নিত্য কলহ, মেজাজ রুষ্ট, শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইয়া যায়। এই পৃথিবীতেই কত প্রকার উপভোগ্য জিনিস আছে, রূক্ষ মেজাজের লোক সে সব কিছুই উপভোগ করিতে পারে না—জীবনটাই যেন তাহার নিকট একটা বোঝা বলিয়া মনে হয়। তাহার এই স্বভাবের জন্য সে যে শুধু নিজের জীবনটাই নষ্ট করে তাহা নয়, তাহার আত্মীয় পরিজন সবাইর জীবনই সে অসহনীয় করিয়া তোলে। মানুষের স্নায়ুর সঙ্গে মনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। মনের স্বাভাবিক গতি বিগড়াইয়া গেলে, স্নায়ুরও বিশৃঙ্খলা ঘটে। ফলে অজীর্ণ, স্নায়ুবিক দৌর্ব্বল্য, বুক ধরাস্ ধরাস্ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ হয়। মেজাজ সর্ব্বদা ঠাণ্ডা রাখিয়া নিজের অবস্থাতেই সুখী থাকিবে, জীবনে কখনও প্রফুল্লতা হারাইও না।

আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান, পিতা সন্তানের কখনও অমঙ্গল করেন না, আমার এই যে অবস্থা, তাহা আপাতঃ দৃষ্টিতে যতই অতৃপ্তকর হউক না কেন, আমার পক্ষে তাহাই মঙ্গলজনক, এই বিশ্বাস লইয়া যদি আমরা সংসারে চলি তাহা হইলে মানুষের মনে আর অশান্তি থাকিবে না।

শরীর আমাদের ঈশ্বরের দান। স্বাস্থ্যের নিয়ম না মানিয়া এই শরীরের উপর অত্যাচার করিলে ঈশ্বর কখনও তাহা মার্জ্জনা করিবেন না।

স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন লাভের অন্য কোন গুপ্ত মন্ত্র নাই—স্বাস্থ্যের মূল নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে হইবে—স্বাস্থ্য জীবনের ইহাই একমাত্র সত্য।"



স্বাস্থ্যপুরী।

(১)

সে ভারী এক মজার স্বপ্ন।

সেদিন অমলের মনটা ছিল বেজায় খারাপ। তাহারই সহপাঠী বন্ধুদের কথা ভাবিতে ভাবিতে সে স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল। বিমল, রাখাল, বিনোদ ক'দিন হইতে ক্লাসে আসে না। স্কুলের ফেরত তাহাদেরই বাড়ীতে সে গিয়াছিল। যাইয়া দেখে, সবাই সারি সারি বিছানায় শুইয়া আছে, কাহাও বা জ্বর, কাহারও বা সর্দ্দি, কাহারও বা পেটের অসুখ। অমলের মনটা হঠাৎ যেন কেমন খারাপ হইয়া গেল। তাই ত! এমন কেন হয়? এইত তাহারা দিব্যি স্কুলে আসিত যাইত। কিন্তু হঠাৎ এমন কেন হইল? কি কষ্ট!—অসুখের তাড়নায় মুখগুলি তাহাদের শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। এর কি কোন প্রতিকার নাই? এই সব ভাবিতে ভাবিতে সে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুমের ঘোরে সে ভারী এক মজার স্বপ্ন দেখিল।

যেন এক কোন বহু দূর অচিন রাজ্যের উদ্দেশে অমল চলিয়াছে। কত দিন, কত রাত্রি কাটিয়া গেল তথাপি অমল চলিয়াছে—সে পথের সীমা নাই—অন্ত নাই—চলিয়াছে ত দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এমনিই একটানা হাঁটিয়া চলিয়াছে—পথের ঝোপ ঝাড়, বন জঙ্গল, নদ, নদী সব পার হইয়া কত দিন রাত্রি সে হাঁটিয়াছে তথাপি তাহার কিছুমাত্র ক্লান্তি বা অবসাদ আসে নাই, উৎসাহের তার কিছুমাত্র কম্‌তি ছিল না, সে অচিন্‌ রাজ্যে তাহাকে যে পঁহুছিতেই হইবে।

এমনি যাইতে যাইতে পথে তাহার দেখা এক পথিকের সঙ্গে।

পথিক জিজ্ঞাসিল, "বন্ধু, কোথা হইতে তুমি আসিতেছ ? কত দূরে যাইবে ?"

অমল বলিল, "বন্ধু, আমার বসতি ছিল পৃথিবীতে, স্বাস্থ্যপুরীর উদ্দেশে আমি বাহির হইয়াছি। কিন্তু আমি সে রাজ্যের পথ চিনি না। কোন পথে যাইতে হইবে আমায় বলিয়া দিবে বন্ধু ?"

পথিক বিস্ময়ে অবাক হইয়া অমলের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া উত্তর করিল, "তোম্‌রা পৃথিবীর লোক—সে রাজ্য ত তোমাদের জন্য নয়। ফিরিয়া যাও বন্ধু, স্বাস্থ্যপুরী

এখনও পৃথিবীর চাইতে অনেক দূরে। পৃথিবীর লোক ত এখনও স্বাস্থ্যপুরীতে আসিবার উপযুক্ত হয় নাই।"

অমল কিন্তু একেবারে নাছোড়বন্দা। পথিককে সে ধরিয়া বসিল, স্বাস্থ্যপুরীর পথ তাহাকে দেখাইয়া দিতে হইবেই।

অমল বলিল,—"কি সুখে আর ছাই পৃথিবীতে থাকিব! সুখের সেরা সুখ স্বাস্থ্যই যদি সেখানে খারাপ হইয়া গেল তবে আর বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? আমি তাই স্বাস্থ্যপুরীর সন্ধানে চলিয়াছি—এমন দেশ যেখানে অসুখ বিসুখ রোগ তাপ কিছুই নাই। বলিয়া দাও বন্ধু, কোথায় সে পুরী, আমি আর পৃথিবীতে ফিরিব না।"

পাঁচ কথায় পথিকের সঙ্গে অমলের বেশ বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিয়াছিল। তাই অমলের উপরোধ আর সে ঠেলিতে পারিল না। পথিক স্বাস্থ্যপুরীর পথ অমলকে দেখাইয়া দিল, অমল এইবার স্বাস্থ্যপুরীর সোজা পথ ধরিল। আবার কত দিন কত রাত্রি হাঁটিতে হাটিতে সে আসিয়া যেখানে পঁহুছিল—

সে এক অপূর্ব্ব পুরী—

সে কি সুন্দর দেশ! তাহার পাহাড়, পর্ব্বত, নদ নদীর কি অপূর্ব্ব শোভা! পথ, ঘাট, ঝোপ, ঝাড়, বন জঙ্গল

সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে—কোথাও—এতটুকু ময়লা নাই। প্রকৃতিতে যেন চির বসন্ত—গাছের ডালে সবুজ পাতা, তার উপর—কাল পাখী বসিয়া মনের আনন্দে গান গাহিতেছে। মানুষেরই বা সে কি অপূর্ব্ব রূপ! এমন সুন্দর মানুষ ত অমল কোন দিন দেখে নাই। স্বাস্থ্য, রূপ সৌন্দর্য্য যেন তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে উথলিয়া পড়িতেছে। দেশের কোথাও রোগ, তাপ, জরা নাই। সবাই মনের আনন্দে খেলিয়া গল্প করিয়া কাজ করিয়া বেড়াইতেছে। অমল তখন বুঝিল—

এই স্বাস্থ্যপুরী—

(২)

অমলের ছিল কতকগুলি বদ্‌ অভ্যাস। কিন্তু এ স্বাস্থ্যপুরীর দেশ—ওসব বদ্‌ অভ্যাস ত আর এখানে রাখা চলে না। তাই অমলকে সে সবই ছাড়িতে হইল। এখানকার ছেলে বুড়ো সবাই জন্মাবধি স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি মানিয়া চলে, তাই ধীরে ধীরে অমলেরও সেগুলি আয়ত্ত হইয়া গেল।

অমলের কোন কষ্ট ছিল না। সে দেশের লোকেরা পৃথিবীর এই নূতন লোকটীকে পাইয়া ভারী খুসি হইয়াছিল। তাহারা নিজেরা উদ্যোগ করিয়া এই নূতন

আগন্তুককে তাহাদের দেশের কত কি সব নূতন জিনিষ দেখাইল। অমল একে একে তাহাদের সঙ্গে সে দেশের সব দেখিল, কত কি অদ্ভুত দৃশ্য সব—কিন্তু কই, দক্ষিণ দিকে ত তাহারা তাহাকে লইয়া গেল না। অমল একদিন একজনকে বলিল—

"চল ভাই! দক্ষিণ দিকটা এইবার দেখি, সে দিকটা ত একবারও দেখা হইল না।"

সেই লোকটি অবাক্ হইয়া বলিল,—"সে কি ভাই। ওদিকে বুঝি আবার মানুষ যায়। ছ্যা, ছ্যা, অমন কথা মুখেও আনিও না।"

বেচারা অমল আর করে কি, অপ্রস্তুত হইয়া মুখ বন্ধ করিল।

কিন্তু মুখ বন্ধ করিলে কি হয়। মন ত আর তাহাতে প্রবোধ মানে না। সেই এক দক্ষিণদিকের চিন্তা তাহার মনে ঢুকিয়া তাহাকে একেবারে—অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। অমল দিন রাত্রি ভাবে, তাই ত, দক্ষিণদিকে কি আছে।

সেদিন সকালে অমল সঙ্গীদের না লইয়া একাই ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। ঘুরিতে ঘুরিতে অমল যাইয়া হাজির, দক্ষিণদিকের সেই প্রকাণ্ড পাহাড়টার

তলে। এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে দেখে এক কোণে একটি ছোট্ট সুড়ঙ্গ—গাছ পাতা দিয়া ঢাকা। অমল কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া সরাসর সেই সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। ভিতরে সেকি ভীষণ অন্ধকার! অমলের গাটা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। কিন্তু যখন একবার আসিয়াছে তখন শেষ পর্য্যন্ত ত তাহাকে দেখিতেই হইবে। অমল সেই ঘোর অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে আরও খানিকটা অগ্রসর হইল। কিন্তু কিছু দূর যাইতে না যাইতে কি একটা শক্ত জিনিষে তাহার মাথা ঠুকিয়া গেল। হাত দিয়া দেখে একটা প্রকাণ্ড লোহার দরজা। কিন্তু শুধু কি তাই?

আবার কিসের চীৎকার?

কিসের যেন গোঙানি শব্দ আকাশ বাতাস ভেদ করিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিতেছে— যেন মেয়ে পুরুষ, ছেলে বুড়ো সবার স্বর এক সুরে, একতানে বাজিয়া উঠিয়াছে! অমল কাণ খাড়া করিয়া শুনিল সে গোঙানির মধ্য দিয়া একটি ঝঙ্কার মাত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

দরজা খোল! দরজা খোল!

সে স্বরের মধ্যে ছিল প্রাণভাঙ্গা মন-গলান কাকুতি

মিনতি। অমলের মন গলিয়া গেল। সে ভাবিল এই পোড়া স্বাস্থ্যপুরীর লোকেরা হয় ত তাহাদের কোন পরাক্রমশালী শত্রুকে এই পর্ব্বত গুহার মধ্যে আটকাইয়া রাখিয়াছে—কি পাষণ্ড এই দেশের লোকেরা। অমল আর কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই সেই দরজার প্রকাণ্ড অর্গলটা ঝনাৎ করিয়া খুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে কিসের যেন একটা তীব্র আওয়াজ দিগন্ত কম্পিত করিয়া বাজিয়া উঠিল। সেই প্রকাণ্ড লোহার দরজাটা কড়্ কড়্ শব্দে খুলিয়া গেল। তাহার পরই প্রকৃতির সে কি দাপাদাপি মাতামাতি—দেখিতে দেখিতে ঘন কালো মেঘে সব আচ্ছন্ন হইয়া গেল, দূষিত বায়ুর গন্ধে আকাশ পাতাল ভরিয়া উঠিল—যেন বিশ্বের অমঙ্গল আসিয়া সেখানে জড় হইয়াছে,—কি একটা প্রলয় ব্যাপার ঘটিয়া যাইবে।

অমল অবাক হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। ভয়ে বিস্ময়ে তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সে দেখে বিশ্বের যারা শত্রু সব আজ বাহির হইয়া এই সোনার রাজ্য ছারেখারে দিবে। মনের সব সাহস জড় করিয়া অমল তখনই সেই দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

তাহার পরই আবার সেই চীৎকার। আবার সেই গোঙানি শব্দ।

অমল সেই সুড়ঙ্গ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে, এই সময় দেখে স্বাস্থ্যপুরীর লোকেরা আসিয়া গুহামুখে জড় হইয়াছে। সেই ভীষণ শব্দ শুনিয়া সকলেই যে যার কাজ ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছিল; দক্ষিণ দিকে আসিয়া দেখে এই কাণ্ড! অমল বেচারার আর বলিবার কিছুই ছিল না। সে হাঁ করিয়া তাহাদের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহারা আর কোন কথা না বলিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া রাজার নিকট লইয়া চলিল।

(৩)

স্বাস্থ্যপুরীর রাজার বিরাট দরবার বসিয়াছে। দরবার বসিতে প্রথমেই বিচার হইবে অমলের। অমলকে আনিয়া সবাই হাজির করিল। একজন উঠিয়া বলিল,

"মহারাজ, প্রথমেই আমরা অনেকে বলিয়াছিলাম পৃথিবীর লোককে এই স্বাস্থ্যপুরীতে আসিতে দিয়া কাজ নাই,—ইহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হউক। ঈশ্বর ত এই পৃথিবীর লোককে আমাদেরই মত জ্ঞান বুদ্ধি সব দিয়াছেন, কিন্তু তথাপি যখন উহারা সেই জ্ঞান বুদ্ধির ব্যবহার না করিয়া ঐ সোনার পৃথিবীটাকে অমন বিশ্রী

কদর্য্য করিয়া রাখিয়াছে তখন কি উহারা স্বাস্থ্যপুরীতে আসিয়াও এই স্বাস্থ্যপুরীর নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে পারিবে? উহাদের যদি তেমন ইচ্ছা থাকিত তবে পৃথিবীটাকেই ত উহারা স্বাস্থ্যপুরী করিয়া তুলিতে পারিত। বিদ্যাবুদ্ধি থাকিলেও পৃথিবীর লোকেরা মানুষ নহে—তাই পৃথিবীটাকে উহারা রোগের আবাস করিয়া তুলিয়াছে। এখন নিজেদের সর্ব্বনাশ করিয়া এই লোক আসিয়াছে, আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে। আমরা এই লোককে দক্ষিণ দিকে যাইতে বলি নাই, যাইতে নিষেধ করিয়াছি—কিন্তু আমাদের নিষেধ না মানিয়া এই লোক দক্ষিণ দিকে যাইয়া সেই গিরিগহ্বরের দরজা খুলিয়া দিয়াছিল—আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করিতে। আর একটু হইলেই আমাদের এই স্বাস্থ্যপুরী পৃথিবীরই সামিল হইয়া যাইত।

রাজা তখন বলিলেন,

"তোমার কি বলিবার আছে, বন্দি?"

অমল উত্তর করিল,

"মহারাজ! এ আমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়—এই রাজ্যের সবটাই দেখিলাম—কিন্তু দক্ষিণ দিকটা দেখি নাই, তাই প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছিল দক্ষিণ দিকটায় কি

আছে দেখিতে। আপনি হয় ত জানেন না পৃথিবীর লোকেরা কিছু অনুসন্ধিৎসু—জানিবার, সব শিখিবার আগ্রহটা তাদের কিছু বেশী। আমিও সেই আগ্রহবশেই দক্ষিণ দিকে গিয়াছিলাম—আপনার রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য নয়। কিন্তু ব্যাপারটা কি হইল আমি এখনও ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

রাজা সব শুনিয়া বলিলেন—

"এ লোককে অপরাধী করা যায় না। যাক্, তোমাদের মধ্যে একজন এই লোককে দক্ষিণ দিকে কি আছে দেখাইয়া আন। শুধু চোখে সে সব দেখিয়া ত বুঝিবে না—আমার মন্ত্রপূত চশমাটা উহাকে পরাইয়া দাও—তাহা হইলে গাছ, পাথর, জীব জন্তু, প্রভৃতি সবাইয়ের অন্তরের কথা, ব্যথা সে শুনিতে ও দেখিতে পাইবে। তাহার পর এই লোকের বিচার রাজসভায় হইবে।"

অমল মহাখুসি হইয়া সেই লোকটির সঙ্গে দক্ষিণ দিকে চলিয়া গেল।

(৪)

আবার দক্ষিণ দিকের সেই প্রকাণ্ড দরজাটা খুলিয়া গেল। অমল ও সেই লোকটি যাইয়া সেই গহ্বরের

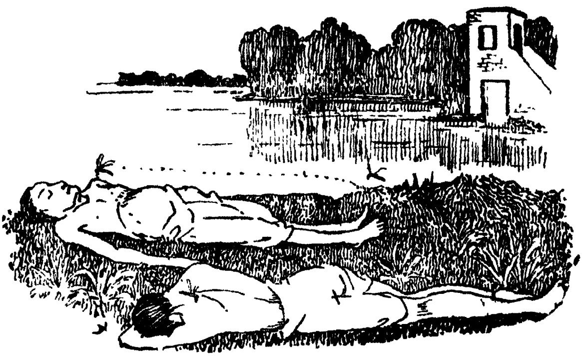
ভিতর ঢুকিল। ঢুকিয়াই সঙ্গের সেই লোকটি খুব সাবধানে আবার দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল।

ভিতরে যাইয়া অমল দেখে সারি সারি সব ঘেরা যায়গা রহিয়াছে—সব অর্গল বন্ধ। সেই লোকের কথামত অমল ঘুরিয়া ফিরিয়া সব দেখিতে লাগিল।

সেখানে যাইয়া অমল দেখে প্রকৃতির যত কিছু ময়লা আবর্জ্জনা বিশ্রী সব একস্থানে অর্গলবদ্ধ অবস্থায় জড় হইয়া আছে। দিব্য দৃষ্টির প্রভাবে অমল প্রত্যেক জিনিষের অন্তরের কথা—তাহার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইল।

এক স্থানে অমল দেখে যত সব পচা পুকুর, আর তাতে এঁদো, ঘোলাটে জল; কেউ বা সেই পুকুরপাড়ে ম্যালেরিয়া জ্বরে মরিয়া পড়িয়া আছে। আবার কেউবা কলেরা রোগে গতায়ু হইয়াছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই হতভাগ্য লোকদের, সেই সব জীবাণুদের জীবনের প্রত্যেক ঘটনাটি তাহার সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। অমল দেখে যত সব রোগের জীবাণু সেই জলের মধ্যে কিলি-বিলি করিতেছে। আর এক মশা মহানন্দে সেই এঁদো পুকুর হইতে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু লইয়া আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কাহার গায়ে হুল ফুটা-

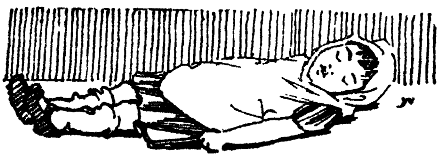
ইয়া দিবে এই সন্ধানে। খানিকক্ষণের মধ্যেই আর একটি অতীত ইতিহাস তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল—অমনই একটি মশা এক ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়াইয়া তাহার জীবাণু লইয়া একটি সুস্থ ঘুমন্ত পুরুষকে কামড়াইয়া ছিল—এমনি করিয়াই সে ম্যালেরিয়াগ্রস্থ হইয়া অকালে—প্রাণ হারাইল।



ঘুমন্ত পুরুষকে কামড়াইয়াছিল।

আর এক যায়গায় যাইয়া অমল দেখিল একটা ইন্দুর ও একটা মরা মানুষ পাশাপাশি পড়িয়া আছে। তাহাদের অতীত জীবনের কাহিনী স্মরণ করিতেই বুঝিল, ঐ ইন্দুরটার হইয়াছিল প্লেগ। একটা ইন্দুরে মাছি আসিয়া

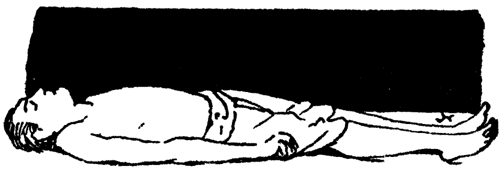
ইন্দুরটাকে ধীরে ধীরে আক্রমণ করিতে লাগিয়া গেল। রোগের জীবাণুও সেই সঙ্গে মাছিটার মধ্যে রহিয়া গেল। ঐ বেচারী—লোকটাকে যখন মাছিটা কামড়াইল তখন তার শরীরের মধ্যেও ঐ রোগের জীবাণু যাইয়া ঢুকিল। প্লেগ হইতে আরাম হওয়াত আর সহজ নয়—বেচারা আর বাঁচিল না। স্বাস্থ্যপুরীর লোকেরা ঐ ইন্দুরের গলায় কাল ফিতা বাঁধিয়া টানাইয়া রাখিয়াছিল (ফাঁসি নাকি ?) যেন লোকে ইন্দুরের কাছে বড় বেশী না ঘেঁসে।



এমন করিয়া অকালে সে প্রাণ হারাইয়াছে।

এক যায়গায় কয়েকটি ছেলে মেয়ে মরিয়া পড়িয়াছিল। সেই লোকটির নিকট খবর লইয়া অমল জানিল, তাদের বাপ মা ঐ ছেলেমেয়েদের জল হাওয়া সহ্য না করাইয়া পুতি পুতি করিয়া রাখিত তাই বেচারারা অকালেই ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে। এমনই একটি ছেলের জীবন তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। জামা কাপড়

আঁটিয়া জানালা দরজা বন্ধ করিয়া তাহাকে দিবা রাত্র রাখা হইত—এমনি করিয়াই অকালে সে প্রাণ হারাইয়াছে।



বন্ধ ঘরে একটী লোক মরিয়াছিল।

তারই পাশে একটা বন্ধ ঘরে একটি লোক মরিয়াছিল। সে বেচারা অতিরিক্ত সাবধান হইয়া ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিন কাটাইত তাই বিশুদ্ধ হাওয়ার অভাবে মারা গিয়াছে—পৃথিবীর কত লোকের স্বাস্থ্যই না নিত্যই এমনি বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

এক যায়গায় একদল লোক পাশাপাশি গাদি হইয়া পড়িয়া আছে—অমল খবর লইয়া জানিল তারা ছিল ভারি

নোঙরা, সাত জন্মেও স্নান করিত না, তাই তাদের চামড়ার দরজা অর্থাৎ লোমকুপ সব বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। চর্ম্মরোগে তাহারা মারা গিয়াছে। এমনি নোঙরামি করিয়া কেউ কেউ দাঁত মাজে না—দাঁতের রোগে সে ভুগিয়া মরে। কেউ বা নোঙরামি করিয়া নিজেদের ড্রেণ

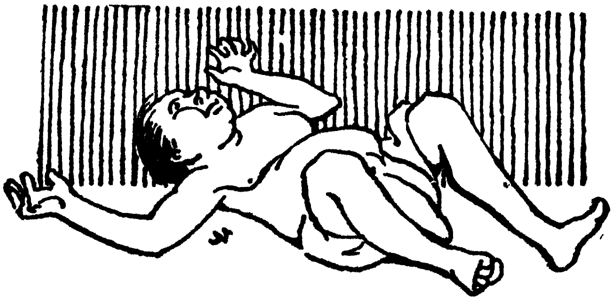


নোঙরামির ফল—চর্ম্ম রোগ

পরিষ্কার করে নাই—তাই নিত্য রোগে ভুগিয়া তিলে তিলে তাহারা নিজেদের শরীর ক্ষয় করিয়াছে।

কোথাও বা দেখা গেল পেটুকরাম অতিরিক্ত খাইয়া তাল সামলাইতে না পারিয়া মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে,

আবার কোথাও বা কেহ সারবান খাদ্যের অভাবে অকালে প্রাণ হারাইয়াছে।



পেটুকরাম।

সেই দিব্য চশমার কল্যাণে এমনই একটি পেটুকরামের জীবনী তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল---সে বেচারা খাইয়াছিল গাণ্ডে পিণ্ডে—তাই হাঁস ফাঁস করিয়া শেষটা মারা গেল।

এক জায়গায় মাতালের কি দুরবস্থা, দেখা গেল। বেচারা নেশায় ভোর হইয়া একেবারেই জ্ঞান হারাইয়াছিল,

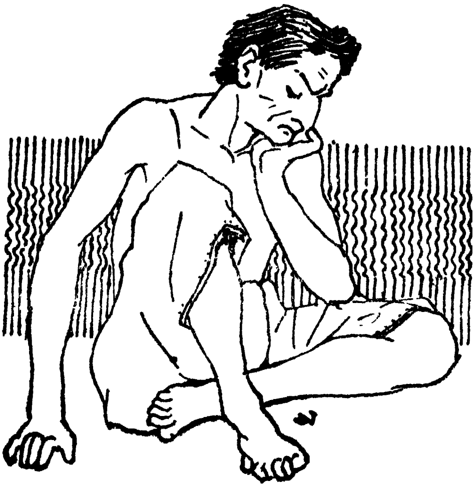
পরিধানে কাপড় নাই, সর্ব্বাঙ্গ বিক্ষত—এমনি করিয়াই সে জীবন হারাইয়াছে।



মাতাল

এক যায়গায় একটা মরাকে দেখিয়া অমল ভারি আশ্চর্য্য হইল। বেচারার মুখটা খুবই বিষণ্ণ; কিন্তু কোন

রোগ ত দেখা গেল না। কিন্তু তখনই দেখিতে পাইল, ঐ বিষণ্ণতা রোগেই লোকটা মারা গিয়াছে। সারা জীবনভোর সে বিষণ্ণ ভাবে দিন কাটাইত; ঐ বিষণ্ণতা



এমনি করিয়াই সে প্রাণ হারাইয়াছে।

হইতেই নানাপ্রকার রোগ বেচারার হইয়াছিল, শেষটা তার খাবার হজম পর্য্যন্ত হইত না। এমনি করিয়াই সে প্রাণ হারাইয়াছে।

এক যায়গায় মড়ার ভারি ভীড়। অমল পরীক্ষা করিয়া দেখিল সেগুলি সব ক্ষয় রোগের রোগী। পৃথিবীতে তাহারা স্বাস্থ্যের মোটামুটি নিয়মগুলিও মানে নাই, তাহাদের দেহ তিলে তিলে ক্ষয় হইয়াছে। যে জায়গায় তাদের দেহগুলি ছিল সেখানে আলো ও বাতাসের চিহ্নমাত্র ছিল না। অমল বুঝিল এমনই অন্ধকারে বন্ধ ঘরে থাকিয়াই তাহারা এই রোগ বাধাইয়াছিল। প্রকৃতির নিয়ম না মানিয়া চলিলে এমনি লোকের সাজা হয়।

অমলের তখন মনে পড়িল আমাদের দেশের অনেক অবোধ মেয়েদের কথা—তাহারা দরজা জানালা বন্ধ করিয়া স্তিমিত প্রদীপের আলোকে সেলাই প্রভৃতি কত কাজ করিয়া থাকে—এমনি করিয়া তাহারা নিজেদের স্বাস্থ্য ও শরীর নস্ট করিয়া অকালে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়।

আরও কত কি দৃশ্য সেখানে ছিল। কিন্তু যে গুলি দেখিয়াছিল, তাহাতেই অমলের শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সে দূষিত বায়ু অমল আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। অমল বুকভরা চিন্তা ও বেদনা লইয়া গহ্বরের বাহিরে চলিয়া আসিল।

(৫)

অমল যখন রাজার দরবারে আসিয়া আবার হাজির হইল। রাজা সোৎসাহে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,



এমনি করিয়া তাহারা নিজেদের স্বাস্থ্য ও শরীর নষ্ট করিয়া অকালে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়।

"কি হে আগন্তুক, সব দেখিলে ?"
অমল ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল

রাজা বলিলেন, "আগন্তুক, তোমরা পৃথিবীর লোক; তোমরা হয়ত আমাদের এই স্বাস্থ্যপুরীর নিয়ম জান না। আমাদের রাজ্যের প্রত্যেককেই স্বাস্থ্যের মোটামুটি নিয়ম কয়টি মানিয়া চলিতে হয়। এখানকার প্রত্যেক স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীতে স্বাস্থ্যের গল্প শুনান হয়। তাই ছেলে-বেলা হইতেই স্বাস্থ্যের নিয়ম সম্বন্ধে সবাইয়ের মোটামুটি একটা ধারণা জন্মায়। এ রাজ্যের সবাইকে সে নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়—না মানিলে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয়। তাহা সত্ত্বেও যাহারা স্বাস্থ্যের নিয়ম না মানিয়া নিজেদের প্রাণ দেয়, স্বাস্থ্যপুরীর আইন অনুসারে তাহাদের বাস হইবে রাজ্যের বাহিরে ঐ পর্ব্বত গহ্বরের মধ্যে। রোগ, অসুখ, রোগের জীবাণু প্রভৃতি স্বাস্থ্যের প্রতিকূল যত কিছু' সব ঐ পর্ব্বত গহ্বরের মধ্যে ঠেলিয়া রাখিয়াছি—এ রাজ্যে তাহাদের স্থান নাই। তোমরা পৃথিবীর লোক, তোমরাও যদি আমাদের মত এইরূপ স্বাস্থ্যের নিয়ম মানিয়া চল তবে তোমাদের পৃথিবীও ত স্বাস্থ্যপুরীই হইতে পারে। কিন্তু তোমরা ভারী অলস ভারী মুর্খ—নিজেদের ভালর জন্য এই সাধারণ নিয়ম কয়টিও মান না—তোমাদের আর কি বলিব।

এই সময়ে একটি লোক মনে করাইয়া

দিল, এই লোককে কি শাস্তি দিবেন বলিয়াছিলেন!

রাজা বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমার শাস্তির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। স্বাস্থ্য পুরীর নিয়ম ভাঙ্গিবার জন্য তোমার শাস্তি হইল—এই রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন—তুমি পৃথিবীর লোক—আবার পৃথিবীতে যাও।"

এইবার অমল বেচারা কাঁদিয়া ফেলিল। এত কষ্ট করিয়া সে স্বাস্থ্যপুরীতে আসিয়াছিল, তাহাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে!

রাজা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন।

"আগন্তুক, দুঃখ করিও না। এ রাজ্যে তোমার স্থান হইল না বটে, কিন্তু পৃথিবীতে যাইয়া তুমি অনেক কাজ করিতে পারিবে। এ রাজ্যের ত সব দেখিলে শুনিলে—এখন পৃথিবীকেও ঠিক স্বাস্থ্যপুরী করিতে পার কিনা তাহার চেষ্টা দেখ। পৃথিবীতে যাইয়া সেখানে স্বাস্থ্যের বাণী শুনাও—সেখানেই তোমার কার্য্য—সেখানেই যাইয়া কার্য্য আরম্ভ কর।"

অমল বলিল, "কিন্তু পৃথিবীর লোক যে স্বাস্থ্যের কথা শুনিতে চায় না।"

রাজা বলিলেন, "শিখিবার কোন জিনিষ শিশুকালেই

মানুষ শিখিয়া থাকে। আমাদের এই দেশে খুব ছেলে-বেলাতেই ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের গল্প বলা হয়। আমাদের ছেলেমেয়েরা রূপকথার চাইতেও সেই সব গল্প শুনিতে ভালবাসে। সেই সব গল্পের ভিতর দিয়া তাহারা স্বাস্থ্যের সব নিয়ম কানুন শেখে। তুমিও সেই গল্পগুলি শুনিয়া যাও। পৃথিবীতে যাইয়া সেই দেশের ছেলেমেয়েদের এই সব গল্প শুনাইবে—তাহা হইলে তাহারাই পৃথিবীকে স্বাস্থ্যপুরী করিয়া গড়িয়া তুলিবে।"

অমল এত বড় একটা কাজের ভার পাইয়া মহা খুসি হইয়া চলিয়া গেল। তাহার নির্ব্বাসন দণ্ড আর তখন তাহার নিকট দণ্ড বলিয়া মনে হইল না—তাহা যেন তাহার নিকট মস্ত বড় একটা আশীর্ব্বাদ মনে হইতে লাগিল।